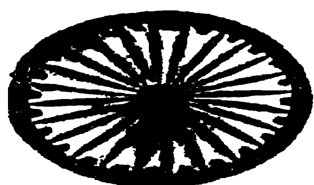
অনুশীলন সমিতির

পি. মিত্তির



ক্ষীরোদ কুমার দত্ত

প্রকাশক :—
রত্না দত্ত,
স্কুল রোড্,
পোঃ হালতু,
২৪-পরগণা।

প্রকাশ : আষাঢ় ১৩৬৬

দ্বিতীয় সংস্করণ

মুদ্রণে :—
কর্মযোগ আশ্রম প্রেস,
১২১, নিউ টালিগঞ্জ,
পোঃ—পূর্ব পুটিয়ারী,
২৪-পরগণা।

।। অনুশীলন সমিতির পি. মিত্তির ।।

প্রথম পরিচ্ছেদ

১৮৩০ সাল থেকে আরম্ভ করে পরবর্ত্তী অর্ধ শতাব্দী কাল যাঁরা বাঙ্গালী তথা ভারতীয় সমাজের নেতৃত্ব করে গিয়েছেন তাদের মধ্যে ছিলেন রাম গোপাল ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, রামতনু লাহিড়ী, প্যারীচাঁদ মিত্র, শিব চন্দ্র দেব, দক্ষিণা রঞ্জন মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিক চন্দ্র মল্লিক, হর চন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, বাঙ্গালীকে যাঁরা স্বদেশ-প্রেম শিখিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে রামগোপাল ঘোষ অন্যতম।

কিন্তু প্রথমদিকে বাঙ্গালীর এই স্বাধীনতাস্পৃহা ধর্ম ও সমাজের প্রচলিত বিধির বিরুদ্ধে বিদ্রোহরূপেই আত্মপ্রকাশ করল। নব্যসমাজ পুরাতনকে ভেঙ্গে তারই উপর গড়তে চাইল নূতনের ভিত্তি। প্রকৃতপক্ষে উনবিংশ শতাব্দীর ধ্বংসোন্মাদনার মধ্যেই আমরা পরিচয় পাই বাঙ্গালীর বিপ্লবীমনের। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, বাঙ্গালী চিরদিনই নূতনের পূজারী। বৌদ্ধযুগে এই বাংলা বিহার অথবা বৃহত্তর বঙ্গকে অবলম্বন করেই বৌদ্ধ ধর্মনীতি সমগ্র ভারতে এবং বহির্বিশ্বে প্রচারিত হয়েছিল। ইংরেজ আমলেও ইংরেজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য ভাবধারা এবং স্বদেশপ্রেম ও বৈপ্লবিক প্রেরণা এই বাংলা দেশ থেকেই সমগ্র ভারতে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। বাংলার শ্যামল ভূমিতে চিরদিনই আমরা দেখি নূতনের আবাহন।

১৮৩৩ সালের সনদে এদেশে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এক-চেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার রহিত হলে বহু বেসরকারী ইংরেজ এ দেশে এসে ব্যবসা-বাণিজ্য আরম্ভ করল। প্রধানতঃ এদেশেই

চেষ্টায় নীলচাষ এবং চাবাগান প্রভৃতি গড়ে উঠল। কলকাতা থেকে দূরে এই সমস্ত ইংরেজের ক্ষমতা ছিল অপ্রতিহত, একমাত্র কলকাতায় সুপ্রীম কোর্টেই এদের বিচার হতে পারতো। এরই সুযোগে তাদের নিরঙ্কুশ উপদ্রব এবং অত্যাচারের মাত্রা বিশেষভাবে বেড়ে গেল। ফলে এদের নিয়ন্ত্রণের জন্য কোম্পানীর পক্ষে নূতন আইন করার প্রয়োজন দেখা দিল। কিন্তু এদের প্রবল বিরোধিতায় এই আইন করার চেষ্টা ব্যর্থ হল ১৮৪৯ সালে।

নীলকর সাহেবদের অত্যাচার এই সময়ে চরমে উঠেছে। ১৮৫০ সালের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় অক্ষয় কুমার দত্ত এর প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রায় একই সঙ্গে এদিকে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তিনিও হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকায় এ সম্বন্ধে ধারাবাহিকভাবে লিখতে থাকেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, সাধারণ বাঙ্গালীদের দেশাত্মবোধ বিকাশে হরিশ্চন্দ্র যতটা সাহায্য করেছেন, এত বোধ হয় আর কেউ করে নি। মাত্র ৩৮ বছর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন। কিন্তু এরই মধ্যে তিনি বাঙ্গালীর কতটা আপনার হয়ে পড়েছিলেন নীচের দুই ছত্র কবিতা তার প্রমাণ—

নীল বানরে সোনার লঙ্কা
করল এবার ছারেখার।
অসময়ে হরিশ ম'ল লঙের হ'ল কারাগার।

বাঙ্গালী সমাজের যখন এই অবস্থা তখন ১৮৫৩ সালের ত্রিশ অক্টোবর ২৪-পরগণা জেলার নৈহাটীর এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবার মিত্র বংশে এক শিশুর জন্ম হয়। শিশুর নাম রাখা হয় ভুলী। পরবর্তীকালে তিনি প্রমথনাথ মিত্র বা পি. মিত্তির নামে পরিচিত হন। সেদিনের বাঙালী সমাজে তাঁর আরও সহজ পরিচয় ছিল 'অনুশীলন সমিতির পি. মিত্তির'।

বালক ভুলীর শৈশব জীবনে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ। পুরা ২ বৎসর ধরে বিদ্রোহ এবং তার দমন প্রচেষ্টা চলেছিল। কারও কারও মতে সিপাহী বিদ্রোহ ভারতের প্রধান স্বাধীনতা সংগ্রাম। কিন্তু তা' হয়ত ঠিক নয়। কারণ সিপাহী যুদ্ধ ইংরেজের বিরুদ্ধে ভারতীয় জাতির প্রথম ব্যাপক সংগ্রাম হলেও এ সংগ্রাম নব যুগের আবির্ভাব সূচনা করে নি। একে বরং প্রাচীন যুগের অবসান বলা যেতে পারে। নব জাতীয়তার অভ্যুদয়ের উপর এর প্রভাবকে অবশ্য অস্বীকার করা চলা না। ইংরেজ এসে এ দেশের সমস্ত প্রচেষ্টাকে ভেঙ্গে দিচ্ছিল তার সাম্রাজ্য বিস্তার প্রচেষ্টায়। সিপাহী বিদ্রোহ ছিল সেই সমস্ত প্রথাকে টিকিয়ে রাখারই চেষ্টা। দেশ বাদশাহী শাসনকে তখন চায়নি কিন্তু সিপাহীরা সেই বাদশাহকেই গদীতে বসিয়েছিল। ভারতবাসীর মধ্যে যারা নব জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল, সিপাহী বিদ্রোহ তাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে নি। কিন্তু তবুও বিদ্রোহের পরোক্ষ ফল যে জাতীয় আন্দোলনের সহায়ক হয়েছিল তা' অস্বীকার করা চলে না। বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে ইংরেজ সরকার চরম অত্যাচারের আশ্রয় নিয়েছিল। দুই বৎসর ধরে এই অত্যাচার চলেছিল ভারতীয় জনতার উপর। এতে যে অসন্তোষের আগুন জ্বলে উঠেছিল তাই এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল নব জাতীয়তাবোধকে বিপ্লবের পথে। মিত্র পরিবার এ প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল ব'লে মনে হয় না। বিশেষতঃ ভারতে দেশাত্মবোধের স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন নৈহাটীর অধিবাসী। মিত্র পরিবার ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিবেশী এবং উভয় পরিবারের মধ্যে যথেষ্ট মিলন ও সংযোগ ছিল।

দীনবন্ধুর নীলদর্পণ প্রকাশিত হয় ১৮৬০ সালে। প্রমথনাথের বয়স তখন ৭ বৎসর মাত্র। ১৮৫১ সালে প্রায় ৫০ লক্ষ দরিদ্র

নিরুপায় চাষী একযোগে নীলচাষ বন্ধ করে দিল। ফলে নীলকর সাহেবদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ আরম্ভ হল। যশোহর চৌগাছার বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস এবং দিগম্বর বিশ্বাস এ আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন। নৈহাটী যশোহর থেকে বেশী দূরে নয়। সুতরাং বালক ভুলীর জীবনের উপর এরও প্রভাব পড়েছিল ব'লে মনে হয়। এ পর্য্যন্ত শিক্ষায়, দীক্ষায় শিক্ষিত সমাজ ইংরেজের নেতৃত্বই মেনে নিয়েছিল। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহ এবং নীল বিদ্রোহের ফলে তারা বুঝল, ইংরেজের স্বার্থ এবং ভারতীয় স্বার্থ এক নয়। বাঙালী সমাজ তখন আত্মপ্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ হয়েছে। বাঙ্গালীর নবলব্ধ চেতনা তার জীবনে স্বাধীনতার প্রেরণা এনেছে। তাই বাঙালীর সাহিত্যে, সভাসমিতিতে, তার নাট্যশালায় আরম্ভ হল এই নূতন ভাবধারারই বহিঃপ্রকাশ। রঙ্গলালের পদ্মিনী কাব্য প্রকাশিত হল ১৮৫৮ সালে সিপাহী বিদ্রোহের মধ্যেই। পরাধীনতার জ্বালা বাঙালী জীবনে তখন অসহনীয় হয়ে উঠেছে। রঙ্গলালের কবিতা সেই ক্ষোভেরই প্রতিধ্বনি:

স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
কে বাঁচিতে চায়?
দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে
কে পরিবে পায়ে?
কোটী কল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে
নরকের প্রায়।
দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গসুখ তায় হে
স্বর্গসুখ তায়।

১৮৬০ সালে মধুসূদনের মেঘনাদ বধ কাব্য প্রকাশিত হল। ভারতীয় পৌরাণিক সাহিত্যে মেঘনাদ ছিলেন রামচন্দ্রের শত্রু। আর বিভীষণ ভগবান রামচন্দ্রের মিত্র, বিশ্বস্ত অনুচর। তার রাক্ষসত্ব প্রায় ঘুচেই গিয়েছিল। কিন্তু মাইকেলের সাহিত্যে আমরা

উভয়কেই নূতনরূপে দেখি। মেঘনাদ ইন্দ্রজিৎ মধুসূদনের কাব্যের নায়ক আদর্শ বীরপুরুষ, আর বিভীষণ জ্ঞাতিদ্রোহী, জাতিদ্রোহী, দেশদ্রোহী। ভারতীয় সমাজে এ পরিচয় নূতন কিন্তু এই নূতনকে চিনতে বাঙ্গালীর বিন্দুমাত্র দ্বিধা আমরা দেখি না। নূতন পরিচয়-সহ মেঘনাদবধ-কাব্যকে বাঙ্গালী সাদরেই গ্রহণ করল। বাঙ্গালী তখন দেশপ্রেম শিখছে ব'লেই দেশদ্রোহ কথাটি বুঝতে তার বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয়নি। মধুসূদনের কাব্যে নূতনের এ পরিচয় যেন বাঙ্গালী জীবনে নবযুগের আগমনী গান। দেশপ্রেমের এই প্রভাবের মধ্যেই বালক ভুলীর শৈশবকাল কেটেছিল।

প্রমথনাথের পিতার নাম ছিল বিপ্রদাস মিত্র এবং মাতার নাম চপলা দেবী। বিপ্রদাস বাবু সিভিল ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। তিনি উচ্চ রাজকর্মচারীপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রমথনাথের মাতুলালয় ছিল হাওড়া জেলায় রিষড়া। মাতামহ ডাঃ বিপ্রদাস দে ছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম এম. বি.। বিশিষ্ট চিকিৎসক ব'লে তার খ্যাতি ছিল।

প্রমথনাথের শৈশবে সমগ্র শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজ বঙ্কিম সাহিত্যের অনুরাগী হয়ে পড়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের দেবী চৌধুরাণী উপন্যাসে লাঠির যে প্রশস্তি ছিল তার প্রতি বালকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া অসম্ভব নয়। উভয় পরিবার নৈহাটীর অধিবাসী হিসাবে বঙ্কিমের এই মনোভাব দ্বারা বালকের পক্ষে প্রভাবান্বিত হওয়া খুবই সম্ভব। বঙ্কিমচন্দ্র ক্ষুব্ধ অন্তরে বলেছিলেন—

"হায় লাঠি! তোমার দিন গিয়েছে। তুমি ছার বাঁশের বংশ বটে কিন্তু শিক্ষিত হস্তে পড়িলে তুমি না পারিতে এমন কাজ নাই। তুমি কত তরবারি দুই টুকরা করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছ। কত ঢাল, খাঁড়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিয়াছ। হায়! বন্দুক আর সঙ্গীন যোদ্ধার হাত হইতে খসিয়া পড়িয়াছে।

যোদ্ধা ভাঙ্গা হাত লইয়া পলাইয়াছে। লাটি, তুমি বাংলার আব্রুপর্দ্দা রাখিতে, মান রাখিতে, ধান রাখিতে, ধন রাখিতে, জন রাখিতে, সবার মন রাখিতে। মুসলমান তোমার ভয়ে ত্রস্ত ছিল, ডাকাত তোমার জ্বালায় ব্যস্ত ছিল, নীলকর তোমার ভয়ে নিরস্ত ছিল। তুমি তখনকার পিনালকোড ছিলে। তুমি পিনালকোডের মত দুষ্টের দমন করিতে, পিনালকোডের মত শিষ্টের দমন করিতে এবং পিনালকোডের মত রামের অপরাধে শ্যামের মাথা ভাঙ্গিতে। তবে পিনালকোডের উপর তোমার এই সরদারি ছিল যে,তোমার উপর আপিল চলিত না। হায়! এখন তোমার সে মহিমা গিয়াছে। পিনালকোড তোমাকে তাড়াইয়া তোমার আসন গ্রহণ করিয়াছে, সমাজের শাসনভার তোমার হাত হইতে তার হাতে গিয়াছে। তুমি লাঠি, আর লাঠি নও, বংশখণ্ড মাত্র। ছড়িত্ব প্রাপ্ত হইয়া শৃগাল কুক্কুরভীত বাবুবর্গের হাতে শোভা কর, কুক্কুর ডাকিলেই সে ননীর হাতগুলি থেকে খসিয়া পড়। তোমার সে মহিমা আর নাই। শুনিতে পাই, সেকালে তুমি নাকি উত্তম ঔষধ ছিলে—মানসিক ব্যাধির চিকিৎসকের মুখে শুনেতেছি, 'মুর্খস্য লাঠ্যৌষধম্"। এখন মুর্খের ঔষধ 'বাপু' 'বাছা', তাহাতেও রোগ ভাল হয় না। তোমার সগোত্র সপিণ্ডগণের মধ্যে অনেকের গুণ এই দুনিয়াতে জাজ্জল্যমান: ইস্তক আড়া বাঁকারি খুটি খোঁটা লাগায়েৎ শ্রীনন্দনন্দনের মোহন বংশী, সকলেরই গুণ বুঝি—কিন্তু, লাঠি! তোমার মত কেহ না। তুমি আর নাই—গিয়াছ। ভরসা করি, তোমার অক্ষয় স্বর্গ হইয়াছে, তুমি ইন্দ্রলোকে গিয়া নন্দন কাননের পুষ্পভারাবনত পারিজাত বৃক্ষশাখায় ঠেক্না হইয়া আছ। দেবকন্যারা তোমার দ্বারা কল্পতরু হইতে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ রূপ ফলসকল পাড়িয়া লইতেছে। এক-আধখানা ফল যেন পৃথিবীতে গড়াইয়া পড়ে।"

পরবর্তীকালে ১৯০২ সালে অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রমথনাথ রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের ইংরেজী দৈনিক পত্রিকা "দি বেঙ্গলী"তে লাঠিখেলা সম্পর্কে এক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। প্রবন্ধেও প্রমথনাথের বঙ্কিমচন্দ্রের অনুরূপ অভিমত দেখি:

"The lathi is the national weapon of Bengal. A Bengalee lathial, properly trained, can with his single lathi keep half-a-dozen swords men at bay.

It is a healthy outdoor exercise. As an art of offence and defence it combines in itself the skill required in the bayonet exercise and the sword exercise. It gives full play to the exercise of muscles. It necessitates the cultivation of the quickness of the eye and quickness of the movement of every limb, which is a very favourable growth of a healthy resoursefulness, activity of the body, strength of muscle and sinew and keenness of the observation and above all, it inspires confidence in its possessor. It is a purely national art and inexpensive. We should be unwise if we allow it to die away from our midst."

প্রমথনাথ বলেন, "লাঠি বাংলার জাতীয় অস্ত্র। সুশিক্ষিত বাঙ্গালী লাঠিয়াল লাঠি হাতে নিয়ে ডজন ডজন অসিধারীকে বাধা দিয়ে রাখতে পারে।

লাঠিখেলা একটি স্বাস্থ্যপ্রদ ব্যায়াম। লাঠি আক্রমণের অস্ত্র এবং আত্মরক্ষার অস্ত্রও। বেয়নেট এবং অসির কৌশল

একাধারে লাঠিতে আছে। লাঠিতে মাংসপেশীর পূর্ণ ব্যায়াম হয়। লাঠিখেলায় দৃষ্টিশক্তির প্রখরতা বৃদ্ধি পায়, এতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের চালনা প্রয়োজন হয়। দেহের শক্তির জন্য এসকল প্রয়োজন। লাঠি হাতে থাকলে লাঠিধারীর সাহস বাড়ে। আমাদের এ জাতীয় যুদ্ধ কৌশলে ব্যয়ও বেশী নয়। ইহাকে বিলোপ হতে দেওয়া আমাদের উচিত নয়।"

বালক অবস্থা থেকেই প্রমথ নাথ লাঠিখেলায় অনুরাগী ছিলেন। বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস কালে বালক ভুলি সমবয়সী বালকদের লয়ে ছুটির পরে প্রতিদিন লাঠি খেলতেন। এক-একদিন খেলোয়াড় সঙ্গী-সাথিদের দুই দলে ভাগ করে কৃত্রিম লড়াইয়ের অবতারণা করতেন। নিজে এক দলে নেতা হয়ে সর্দার লাঠিয়ালরূপে লড়াই পরিচালনা করতেন। প্রমথ নাথের মধ্যে নেতৃত্ব করার গুণ বালক বয়সে দেখা যায়। ভুলির বয়স যখন বার বছর তাঁর মধ্যে লাঠিখেলা পরিচালনার যে নেতৃত্ব গুণ দেখা যায়, ঐ বয়সের বালকের মধ্যে তা' প্রায় দেখা যায় না।

প্রমথনাথের এই মনোভাবই সম্ভবতঃ তাঁকে অনুশীলন সমিতির মাধ্যমে লাঠিখেলা প্রবর্তনে প্ররোচিত করেছিল।

এক সময়ে লাঠি বাঙ্গালীর জাতীয় অস্ত্র ছিল ঠিকই। কিন্তু প্রমথনাথের শৈশবে মধ্যবিত্ত বা উচ্চশ্রেণীর মধ্যে লাঠির প্রচলন ছিল না। নমশূদ্র এবং বাগদী প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর মধ্যেই লাঠিখেলা কিছুটা চলত। জমিজমা রক্ষার কারণে ভদ্রসমাজে লাঠিয়ালের প্রয়োজন কখনও কখনও হত। তখন তাদের নিম্ন-শ্রেণীর শরণাপন্ন হতে হত।

এজন্য লাঠিখেলার প্রতি বালক ভুলীর আকর্ষণ দেখে মাতা চপলা দেবী এবং পরিবারের অন্যান্য মহিলাগণ শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। বালকের জন্ম কার্ত্তিক মাসের কালীপূজার অমাবস্যার রাত্রিতে, তার উপর লাঠিখেলার প্রতি এই আকর্ষণ। পরিবারের

মহিলামহলে ধারণা জন্মিল বালক হয়ত ডাকাত দলের সর্দার হবে। ফলে জননীর আদেশে ভূলীর লাঠিখেলা বন্ধ হল। বালক ক্ষুন্নমনে মায়ের আদেশ মেনে নিল। বিপ্রদাস বাবু এই সময়ে সরকারী কার্য্য উপলক্ষে অন্যত্র ছিলেন।

তিনি গৃহে ফিরে সব কথা জানতে পেরে সহধর্মিণীকে বুঝিয়ে তাঁর ধারণা দূর করে বালকের লাঠিখেলার ব্যবস্থা পুনঃ প্রবর্ত্তন করলেন। বালক দ্বিগুণ উৎসাহে সঙ্গীদের নিয়ে আবার লাঠিখেলা আরম্ভ করল।

লাঠিখেলার প্রতি প্রমথনাথের এই আকর্ষণ আজীবন ছিল। এই জন্য অনুশীলন সমিতির সদস্যদের লাঠিখেলা অবশ্যকর্মসূচী ছিল। সমিতির কর্মীদের তিনি বলতেন "ইংরেজের কাছে যেমন মুষ্টিযুদ্ধ, স্পেনবাসীর কাছে যেমন অসিখেলা, ফরাসীদেশবাসীদের কাছে যেমন কুস্তি, বাংঙ্গালীর কাছেও তেমনই লাঠিখেলা। অনুশীলন সমিতির মাধ্যমে তিনি বাংলার এই লুপ্তপ্রায় জাতীয় হাতীয়ারকে পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সমিতির কলকাতা শাখার সম্পাদক সতীশ বসু এবং ঢাকা শাখার সর্বাধিনায়ক পুলিনবিহারী দাস লাঠিখেলায় বাংলাদেশব্যাপী সুনাম অর্জন করেছিলেন।

শুধু লাঠিখেলা নয়, প্রমথনাথ শৈশব থেকেই অন্যবিধ ব্যায়ামচর্চাও করতেন। এর ফলে তাঁর দেহ দৃঢ়, বলিষ্ঠ এবং সুগঠিত হয়েছিল। সাধারণ বাংঙ্গালীদের মধ্যে তাঁর মত বলিষ্ঠ গঠন পুরুষ কমই দেখা যেত। স্বদেশীযুগে বিভিন্ন সভাসমিতিতে তাঁকে যারা দেখেছেন তাঁরা বলেন, "উষ্ণীষপরিহিত বেশে পি. মিত্র যখন কোন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতেন, তাঁকে দেখে বীর সেনানায়কদের কথাই মনে পড়ত"। স্বদেশী আন্দোলনের সময় প্রমথনাথের বয়স ছিল পঞ্চাশ বৎসরেরও বেশী।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রমথনাথের শিক্ষা আরম্ভ হয় হুগলী কলেজের স্কুল বিভাগে। মাধ্যমিক শিক্ষাও তিনি এখানেই সমাপ্ত করেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি হুগলী কলেজেই ভর্ত্তি হন। এখানে তিনি যখন তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র, সেই সময়ে পিতা বিপ্রদাস বাবু তাঁকে আই. সি. এস পরীক্ষায় প্রতিযোগিতা করবার উদ্দেশ্যে ইংলণ্ডে পাঠিয়ে দেন। এ সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৫ বৎসর। এই বয়সেই বালকের মধ্যে স্বাধীনতা-স্পৃহা অঙ্কুরিত হয়েছে। ফলে সরকারী উচ্চপদ গ্রহণে তাঁর কোন আগ্রহ ছিল না। তবু পিতৃমাতৃভক্ত বালক পিতার ইচ্ছা মেনে নিয়েই ইংলণ্ড গিয়ে প্রয়োজনীয় অধ্যয়ন সুরু করে দিলেন। কিন্তু স্বাধীনভাবে আইন ব্যবসা করবার উদ্দেশ্য নিয়ে ব্যারিষ্টারী পড়বার জন্যও প্রস্তুত হতে লাগলেন এবং এজন্য মিডল টেম্পল-এ ভর্ত্তি হলেন।

সিভিল সার্ভিস প্রতিযোগিতায় অধ্যয়ন সমাপ্ত করে প্রমথনাথ যথাসময়ে পরীক্ষা দিলেন। কিন্তু এই সময় তিনি রক্ত-আমাশয় রোগে ভুগছিলেন। সংস্কৃত পরীক্ষার দিনে তিনি এমন অসুস্থ হয়ে পড়লেন যে, পরীক্ষার হলে উপস্থিত থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হল না। অথচ সংস্কৃতেই তার প্রস্তুতি ছিল সবচেয়ে ভাল। ফলে তিনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলেন না। দ্বিতীয় বার পরীক্ষা দিবার বয়স তাঁর ছিল। কিন্তু এদিকে আকর্ষণ না থাকায় তিনি সে সুযোগ গ্রহণ করলেন না। পিতার অনুমতি নিয়ে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষা দিয়ে পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়ে তিনি দেশে ফিরে এলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ বাংলার ইতিহাসে স্বর্ণযুগ। মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবে বাংলাসাহিত্য তখন ঊর্ধ্বগগনে। ধর্মজগতে রামমোহন, কেশবচন্দ্র এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেব সমগ্র বিশ্বে

সুপরিচিত। স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব আসন্ন। বাঙালী নবীন শক্তিতে জগতে আত্মপ্রকাশ করতে চাইছে। অথচ সামরিক শক্তিতে বাঙ্গালী অশক্ত। দেশের প্রচলিত আইনে সামরিক শক্তি লাভের কোন সুযোগ তার নাই। সামরিক ক্ষেত্রে প্রবেশের অধিকার থেকে বাঙ্গালী বঞ্চিত। এজন্য স্বাধীনতাকামী শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকসমাজেরই ক্ষোভ ছিল। প্রমথনাথও এ-জন্য মনে মনে ক্ষুব্ধ ছিলেন। বিদেশের স্বাধীন আবহাওয়ায় প্রথমেই তিনি ক্রমে অশ্বারোহণ, মুষ্টিযুদ্ধ এবং অসিখেলা শিখেনিলেন। শুধু শিখে নিলেন বললে সবটুকু বলা হবে না। তিনটি বিষয়েই তিনি পারদর্শিতা লাভ করেন। এরপর তিনি ইংলণ্ডের সৈন্যদলে প্রবেশের চেষ্টা করতে লাগলেন। লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিসে বহুবার এজন্য তিনি আবেদন করেন। কিন্তু বাঙ্গালী সামরিক জাতি নয় এই অছিলায় তার আবেদন নামঞ্জুর হল প্রতিবারই। কিন্তু সৈন্যদলে প্রবেশের আগ্রহ প্রমথনাথের এত অধিক ছিল যে, তিনি নিরাশ হলেন না। ফরাসী দেশে গিয়ে তিনি ফরাসী ঔপনিবেশিক বাহিনীতে প্রবেশ করবার জন্যও চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি ফরাসী নাগরিক নন ব'লে সে চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। অন্য কোন প্রকার চেষ্টার সুযোগ নেই ব'লে ব্যারিষ্টার হয়ে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন ছাড়া তার নিকট কোন উপায় রইল না। যে চার বৎসর তিনি বিদেশে ছিলেন, ঐ সময়েও বিভিন্ন দেশের ইতিহাস, দর্শনশাস্ত্র এবং ইংরেজী ও ফরাসীসাহিত্যে দক্ষতা লাভ করেন।

বিলেত থেকে ফিরে আসার পরেই প্রমথনাথের বিয়ের চেষ্টা চলতে থাকে। কিন্তু এ ব্যাপারে এক কঠিন সমস্যা দেখা দিল। সেদিন হিন্দুসমাজ ছিল রক্ষণশীল। বিলাত প্রত্যাগত যুবকের সঙ্গে কন্যার বিয়ে দিতে কোন পিতাই সম্মত হলেন না। এদিকে প্রমথনাথ ছিলেন হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের

প্রতি অনুরাগী। চার বৎসর বিদেশে থেকেও এই অনুরাগ তাঁর বিন্দুমাত্র কমেনি। বিদেশের সমাজের সঙ্গে ভারতীয় সমাজের তুলনা ক'রে স্বীয় সমাজের প্রতি আকর্ষণ তাঁর আরও বেড়েছে। অতি সহজেই তিনি ব্রাহ্মসমাজে অথবা হিন্দুধর্ম্মের বাইরে অন্য কোন সমাজে বিয়ে করতে পারতেন। কিন্তু প্রমথনাথ এতে সম্মত হলেন না। পিতাকে তিনি জানালেন, বর্ত্তমান সমাজের সংস্কার প্রয়োজন সন্দেহ নাই। কিন্তু সমাজের সংকীর্ণতার জন্য সমাজ থেকে সবাই যদি বেরিয়ে যায় কোনদিনই এ সংস্কার হবে না। হিন্দু পরিবারে হিন্দু আচার-পদ্ধতি অনুসরণে তাঁর বিয়ের ব্যবস্থা করতে তিনি পিতাকে বললেন।

শেষ পর্যন্ত প্রমথনাথের আগ্রহই রক্ষিত হল। সেদিনের প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষের পরিবারের সঙ্গে মিত্র পরিবারের সৌহার্দ্য ছিল। বিপ্রদাস বাবুর নিকট প্রমথনাথের অভিমত জানতে পেরে তিনি এ ব্যাপারে সচেষ্ট হলেন এবং তাঁর উদ্যোগে তাঁর এক ভাগিনেয়ীর সঙ্গে প্রমথনাথের বিয়ে হল। কন্যার পিতা কাশীনাথ বসু ছিলেন হিন্দু সমাজের কুলীন বংশের সন্তান। ঢাকা জিলার বিখ্যাত মালখানগর গ্রামে ছিল তাঁর বাস। এই বিয়েতে প্রমথনাথ নিজে এবং মাতাপিতাও সুখী হয়ে ছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ দুই বৎসরের অধিক কাল প্রমথনাথ পত্নীসাহচর্য্য লাভ করতে পারেন নাই। বিয়ের পরে দুই বৎসর অতীত হতে-না-হতেই তাঁর পত্নী বিয়োগ হয়। প্রমথনাথের বয়স তখন বাইশ বৎসর মাত্র। পিতামাতা পুনরায় তাঁকে বিয়ে করতে বললেন। কিন্তু প্রমথনাথ কিছুতেই তাতে সম্মত হলেন না। এইভাবে ক্রমে দুই বৎসর অতীত হল। অল্পবয়সের পুত্র পিতামাতার সম্মুখে সংসারজীবনে বিরত হয়ে জীবনযাপন করবে মাতার এ দুঃসহ হয়ে উঠল। তিনি পণ করলেন, হয় প্রমথনাথ তাঁর বিয়েতে সম্মতি দিবেন নতুবা

তিনি অনশনে দেহত্যাগ করবেন। প্রমথনাথ বাধ্য হয়ে বিয়েতে সম্মতি দিলেন। কিন্তু পাত্রী নির্বাচনে এবং বিয়ের আচার-পদ্ধতি মেনেই হিন্দুধর্ম অনুসারে হবে স্থির হল। প্রমথনাথ দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করলেন। কন্যার পিতা ছিলেন হাওড়া জেলার আন্দুলের সুরথনাথ বসুমল্লিক। কন্যার নাম ছিল সুরেন্দ্রবালা। কন্যার পিতা ছিলেন কলকাতা ওয়েলিংটন স্কোয়ারের বিপ্লবীনেতা দানবীর সুবোধচন্দ্র বসুমল্লিকের জ্ঞাতি।

দেশে এসে প্রমথনাথ হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করেন। নৈহাটী থেকেই তিনি যাতায়াত করতেন। আইন ব্যবসায় পসারের জন্য যে জাকজমক প্রয়োজন তাও তাঁর ছিলনা, ফলে তিন বৎসর ব্যারিষ্টারী ক'রেও তিনি আশানুরূপ উন্নতি করতে পারলেন না। তিনি স্থির করলেন, মফঃস্বলে কোথাও গিয়ে আইন ব্যবসা আরম্ভ করবেন। পিতৃবন্ধু মনোমোহন ঘোষ এবং স্যার তারকনাথ পালিত তাঁকে এ সংকল্প থেকে বিরত হতে বললেন। তাঁরা উভয়েই প্রমথনাথকে স্নেহ করতেন। তাঁদের অভিমত এই যে, ধৈর্য্যধরে থাকলে কলকাতা হাইকোর্টেই ভবিষ্যৎ উন্নতি হবে। কিন্তু প্রমথনাথ চিরদিনই ছিলেন স্থির সংকল্পের লোক। তিনি মেদিনীপুর গিয়ে প্রাকৃটিশ আরম্ভ করলেন। সেখানে গবর্ণমেণ্ট প্লীডার ছিলেন তাঁর জনৈক নিকট আত্মীয়। প্রমথনাথ তার সাহায্য ও সমর্থনের উপর ভরসা করেছিলেন। কিন্তু এক বৎসরেও আইন ব্যবসায়ে কোন সুবিধা হল না। প্রমথনাথ এবারে ধৈর্য্য হারালেন। তিনি স্থির করলেন, আইন ব্যবসা ত্যাগ ক'রে সাংবাদিকের বৃত্তি অবলম্বন করবেন।

এই সময়ে বরিশালে প্রমথনাথের এক মোক্তার বন্ধু তাঁকে বরিশালে গিয়ে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করতে বলেন। বরিশালে অপরাধ বেশী অনুষ্ঠিত হয়। ফৌজদারী বিভাগে সেখানে আইন

ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থাগম হওয়া সম্ভব। তিনি প্রমথনাথকে সর্ব-প্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন। বন্ধুর অনুরোধে প্রমথনাথ বরিশালে গিয়া প্রাকৃটিশ আরম্ভ করলেন। তিনি চার বৎসরকাল বরিশালে ছিলেন। এই অল্প সময় মধ্যেই সমগ্র বরিশাল জেলায় ফৌজদারী মামলা পরিচালনে তিনি বিশেষ সুখ্যাতি অর্জন করেন। পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য জেলায়ও তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর পসার এমনভাবে জমে উঠে যে, তিনি বরিশালে বার এসোসিয়েশনের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হন। ১৮৮২ সালে সুরেন্দ্রনাথ যখন ভারতীয় সিভিল সার্ভিস থেকে অন্যায়ভাবে বিতাড়িত হন প্রমথনাথ তখন বরিশালে। পূর্ব থেকে উভয়ের পরিচয় ছিল। উভয়ে একসঙ্গে লণ্ডনে ছিলেন। দুজনেই মজলিসের সভ্য ছিলেন। প্রমথনাথ ব্যারিষ্টারী পাশ করে প্রথমে দেশে আসেন। সুরেন্দ্রনাথ প্রমথনাথকে কলকাতায় এসে রিপন্ কলেজের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করতে বলেন। তিনি প্রমথনাথকে আরও জানালেন যে, কলকাতায় এলে তার পক্ষে অধ্যাপনার সঙ্গে হাইকোর্টে প্রাকৃটিশ করাও চলবে। প্রমথনাথ এই প্রস্তাবে সম্মত হলেন এবং কলকাতায় এসে রিপন কলেজের আইন এবং লজিকের অধ্যাপক পদ গ্রহণ করলেন এবং হাইকোর্টে পুনরায় ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করেন। এবার আইনব্যবসায়েও তাঁর পসার জমে উঠল। দুই বৎসরের মধ্যেই ব্যারিষ্টারীতে তাঁর এত সময় প্রয়োজন হত যে, শেষ পর্যন্ত অধ্যাপনা ছেড়ে দিতে হল। কয়েক বৎসরের মধ্যেই হাইকোর্টের ফৌজদারী বিভাগে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ ব্যারিষ্টার ব'লে গণ্য হলেন। ব্যবসায় ক্ষেত্রে তাঁর সুখ্যাতি সমগ্র উত্তর ভারতে ব্যাপ্ত হল। তাঁর এই যশ আমৃত্যু বর্ত্তমান ছিল।

• প্রমথনাথ দ্বিতীয়বার কলকাতায় এসে পিতার সঙ্গে নৈহাটীর বাড়ীতেই বাস করতেন। বিলাতফেরত পুত্রকে পরিবারের মধ্যে স্থান দিবার অপরাধে নৈহাটী সমাজ বিপ্রদাস বাবুকে সমাজচ্যুত করে

রাখে। হিন্দু সমাজের এই অন্যায় আচরণে বিপ্রদাস বাবু ক্ষুব্ধ হয়ে সমাজ ত্যাগ করে সপরিবারে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করবেন স্থির করেন। কিন্তু প্রমথনাথ এ ব্যাপারে পিতার সঙ্গে একমত হতে পারলেন না। পিতাপুত্রে এ নিয়ে বহু আলোচনা হল। উভয়ে উভয়কে স্বমতে আনবার চেষ্টা করলেন। প্রমথনাথ পিতাকে বললেন, ধর্মত্যাগ করা কোন মতেই সমীচীন নয়। এ পথে সমাজ সংস্কারে আরও বাধা সৃষ্টি হবে এবং শিক্ষিত সমাজ এভাবে চললে সমাজের ভয়ানক ক্ষতি হবে। কিন্তু কেহই কাহাকেও নিজমতে আনতে পারলেন না। বিপ্রদাস বাবু পরিবারের সকলকে নিয়ে খৃষ্টধর্ম অবলম্বন করলেন। কেবলমাত্র প্রমথনাথ ও তাঁর স্ত্রী হিন্দু রয়ে গেলেন।

কিন্তু পিতামাতার প্রতি প্রমথনাথের ভক্তি এমনই ছিল যে, পিতা ধর্মত্যাগ করলেও তিনি তাঁর সঙ্গে এক পরিবারভুক্ত হয়ে একত্রেই বাস করতে লাগলেন। বিলাতফেরত শিক্ষিত যুবকদল এই সময়ে অনেকেই দেশে ফিরে আলাদা হয়ে বাস করতেন। তাদের চালচলনও ছিল আলাদা ধরণের। হিন্দু সমাজের সঙ্গে তা' মিলতো না। কিন্তু প্রমথনাথ এর বিরোধী ছিলেন। তিনি বলতেন, হিন্দুর মহান ধর্ম, মহতী সংস্কৃতি এবং সুপ্রাচীন সভ্যতার সঙ্গে পাশ্চাত্যের অপেক্ষাকৃত আধুনিক সভ্যতার কোন প্রকার তুলনাই হতে পারে না। নিজেদের উৎকৃষ্টতর সভ্যতা ত্যাগ ক'রে পরদেশী অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট সংস্কৃতি গ্রহণ তিনি কোন ক্রমেই সমর্থন করতেন না। হিন্দুধর্ম ও হিন্দুদর্শন সম্বন্ধে প্রমথনাথের গভীর জ্ঞান ছিল।

বিলাত ফেরত বন্ধুদের ভ্রান্তমত দূর করবার উদ্দেশ্যে প্রমথনাথ পরবর্তী কালে ১৮৯৯ সালে একখানি পুস্তিকা রচনা করেন। বইয়ের নাম—A History of Intellectual Progress of India. পুস্তকখানিতে প্রমথনাথের গভীর স্বধর্মানুরাগ, স্বদেশ ও স্বজাতিপ্রীতি, জ্ঞান এবং পাণ্ডিত্যের পরিচয় মেলে।

নৈহাটী সমাজের পক্ষ থেকে প্রমথনাথের নিকট প্রস্তাব করা হয় যে, তিনি ইচ্ছে করলে প্রায়শ্চিত্ত করে সমাজে প্রবেশ করতে পারেন। শাস্ত্রানুসারে প্রায়শ্চিত্ত করলে হিন্দুসমাজ তাকে গ্রহণে আর আপত্তি করবে না। কিন্তু প্রমথনাথ এ প্রস্তাবে সম্মত হননি। তিনি উত্তরে বলেছিলেন শিক্ষালাভের জন্য তিনি বিদেশে গিয়েছিলেন। কোন পাপ কাজ করেন নি। সুতরাং প্রায়শ্চিত্ত করার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। প্রমথনাথ বুঝেছিলেন, হিন্দুসমাজের এই সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন একদিন হবেই। তাঁর অনুমান অভ্রান্ত। প্রমথনাথ নিজের জীবনেই তা' দেখে গিয়েছেন। জীবিত কালেই প্রমথনাথের পুত্রকন্যাদের বিয়ে হিন্দু পরিবারে সম্পূর্ণ হিন্দুমতে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

প্রমথনাথের মাতৃবিয়োগ হয় ১৮৮১ খৃঃ অব্দে। প্রমথনাথের বয়স তখন ৩৮ বৎসর। এর পাঁচ বৎসর পরে ১৮৮৬ খৃঃ অব্দে তাঁর পিতা পরলোক গমন করেন। ইহার কিছুদিন পরে তিনি বিজাতীয় মনোভাবাপন্ন বন্ধুদের উচ্ছৃঙ্খল মতিগতি দেখে ব্যথিত হয়ে একখানি পুস্তিকা রচনা করেন। তিনি বলেন, যে বিলাতী চাকচিক্যে তারা মুগ্ধ, তা খাঁটি জিনিস নয়। খাঁটি জিনিস একমাত্র ভারতীয়তার মধ্যে নিহিত।

"The anglicised Hindu, educated in the materialistic methods of Europe, dazzled by the glitter of the superficial refinement and of that superficial splendour, which clothes as with a costly garment the social life of modern Europe, cannot perceive lurking underneath the magnificient drapery the dreadful disease which is slowly but surely eating into the system.

বিলাত ফেরত বন্ধুদের আচরণে প্রমথনাথ ব্যথিত হয়েছিলেন। এইজন্যই তাদের কল্যাণের জন্য তিনি এই সমাধান বাণী উচ্চারণ করেছিলেন। প্রমথনাথ বলেছেন, "ইংরেজী ভাবাপন্ন এই সমস্ত হিন্দুরা জড়বাদী ইউরোপের উপরের চাকচিক্য দেখেই মুগ্ধ হন। কিন্তু সেই বহুমূল্য বস্ত্রের নীচে যে ভয়ানক ব্যাধি ইউরোপের সমাজ ব্যবস্থাকে ক্ষয় করে নিচ্ছে তা তারা দেখতে পাচ্ছে না।"

প্রমথনাথ এ সম্পর্কে আরও বলেছেন, ভারতীয় বহুযুগব্যাপী ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি যতদিন ধ্বংস না হচ্ছে পাশ্চাত্যপ্রেমীদের এই ইংরেজীয়ানা ততদিন কিছুতেই এখানে সফল হবে না।

"But before he can transplant on the Indian soil and aclimatise in the Indian climate the social and political life of the west, he has to overcome and demolish the social life, born of her past spirituality which has been existing through the centuries in india. Invasion after invasion, revolution after revolution have swept over the country. Foreign manners the most dissimilar have been introduced in the train of foreign conquerors. But the social policy, grey with age, founded upon the immutable truths of ancient Aryan religion have outlived them all, unchanged, unchangable and everlasting like our own Himalayas the type of the lofty sprituality of noble Hindu race,—the type of screne intellectuality undarkened by passion or desire."

প্রমথনাথের কথার মর্ম এই যে, পবিত্র ভারতভূমিতে বিজেতার পর বিজেতা বহু বিদেশীভাবধারা নিয়ে এসেছে কিন্তু ভারতের শাশ্বত আধ্যাত্মিকতা তার হিমালয়ের মতোই মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। সুতরাং ইংরেজী ভাবাপন্ন সমাজের এই প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হবে তাতে সন্দেহ নেই।

হিন্দু ধর্মে এবং ভারতের আধ্যাত্মিকতায় প্রমথনাথের আস্থা কত গভীর ছিল এই দিয়েই তা বুঝা যায়। শাস্ত্রোক্ত অনুষ্ঠানে তাঁর বিশ্বাস ছিল গভীর। এজন্য পরবর্তীকালে অনুশীলন বিপ্লবী কর্মীদের তিনি দীক্ষাদানের ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি নিজেও চট্টগ্রামের স্বামী পূর্নানন্দের নিকট যোগদীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। বাড়ীতে কখনও কখনও তিনি যজ্ঞানুষ্ঠান করতেন।

প্রমথনাথের স্বাদেশিকতা শূন্যগর্ভ ছিল না। সেই সুদূর অতীতে শিক্ষিত বাঙ্গালীর সমাজজীবনে ইংরেজীরই প্রাধান্য ছিল বেশী, বাংলাভাষা ছিল অপেক্ষাকৃত অবহেলিত। প্রমথনাথ তখনই বাংলা ভাষায় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন।

প্রমথনাথের আগে এদিকে আর কেহ মনোযোগী হয়েছেন মনে হয় না। তিনি শুধু এবিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেই ক্ষান্ত হন নাই, অধ্যাপক জীবনে ছাত্রদের বাংলাভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে 'লজিক' শিক্ষার জন্য 'তর্কতত্ত্ব' নামে একখানি পুস্তক রচনা করেছিলেন। এছাড়া বাংলাভাষার মাধ্যমে শিক্ষা নিয়ে তিনি সেদিনের সংবাদপত্রে বহু প্রবন্ধও লিখেছিলেন।

প্রমথনাথ একজন সুসাহিত্যিকও ছিলেন। আজীবন তিনি সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যের চর্চা করতেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে বাংলা-ভাষায় তিনি 'যোগী' নামে একখানি উপন্যাস লিখেছিলেন। 'যোগী' উপন্যাসে স্বদেশপ্রেমী প্রমথনাথের মানসিক প্রকৃতির ছবি পাওয়া যায়। তাঁর বিদ্রোহী স্বভাবের ছবি এই উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে। উপন্যাসের রচনা শৈলীও প্রমথনাথের সাহিত্য সাধনার

পরিচয় দেয়। ভারত চিরদিনই গুরুর আদর্শে বিশ্বাসী। ক্ষত্রিয় রাজা রাজত্ব করতেন কিন্তু তাঁকে পরামর্শ দিতেন ব্রাহ্মণ। রাজার মন্ত্রী ছিলেন ব্রাহ্মণ। এই আদর্শ নিয়ে প্রত্যেক মহাবীরের একজন গুরু থাকতেন। অর্জুনের পশ্চাতে আমরা দেখি শ্রীকৃষ্ণকে। অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগেও শিবাজীর পশ্চাতে দেখি রামদাস বাবাজীকে। সম্ভবতঃ এই আদর্শ অনুসরণেই প্রমথনাথ তাঁর উপন্যাসের প্রধান নায়ক করেছেন এক 'যোগী'কে। এই যোগী রাজপুতানা প্রবাসী একজন বাঙ্গালী। তিনি রাজকার্য্যে রাণা প্রতাপের পুত্র অমর সিংহকে পরামর্শ দিতেন। অমর সিংহ এই ঐতিহাসিক উপন্যাসের দ্বিতীয় নায়ক। প্রতাপের মৃত্যুর পরে রাজপুতনায় মেবারের গৌরব-রবি অস্তমিত হয়েছে। রাজপুতনার জীবনে অবসাদের অন্ধকার নেমে এসেছে। তারা মোগল সম্রাটের সঙ্গে শান্তিতে বসবাস করবার জন্য আগ্রহী। অভিজাত রাজপুতগণ এরই অনুকূলে অমর সিংহকে পরামর্শ দিচ্ছেন। কিন্তু যোগী রাজপুতনার জীবন থেকে এই মনোভাব দূর করে তাদের মধ্যে সমরোন্মাদনা সৃষ্টির প্রয়াসী। এজন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছেন তিনি। সকলেই সন্ধি স্থাপনের অনুকূলে মত প্রকাশ করলে অমর সিংহ যোগীরাজের অভিমত জানতে চাইলেন।

"যোগীরাজ! শ্রীজীর আজ্ঞা যে, যবনের সঙ্গে সন্ধি সংস্থাপিত হয়। আপনার কি মত"?

যোগীর নয়ন জ্বলিয়া উঠিল; শিরের জটাভার কাঁপিয়া উঠিল। উজ্জ্বল লৌহ উরস্ত্রাণ ঘন ঘন উঠিতে ও পড়িতে লাগিল। সভায় এক গোল উঠিবার উপক্রম হইল। যোগী উঠিয়া দাঁড়াইয়া দক্ষিণ বাহু প্রসারিত করিয়া গোল থামাইলেন। পরক্ষণেই তাঁহার কণ্ঠ বাত্যার আগমনে দূরবর্ত্তী মেঘগর্জ্জনের ন্যায় আস্তে আস্তে সেই প্রকাণ্ড দরীখানার চতুষ্পার্শ্বে শ্রবণগোচর হইল। ঠাকুরগণ নিঃশব্দে সেই যোগীমূর্ত্তির কথা শুনিতে লাগিলেন।

"প্রাতঃস্মরণীয় প্রতাপের পুত্র! মেবারের সমর সিংহ ঠাকুর-বর্গ! আমার এ ভিক্ষাজীবী যোগীর এ বিষয়ে কি মত জানিতে ইচ্ছা কর। আমার মত ব্যক্ত করিবার পূর্বে মেবারের পূর্ব ইতিহাস একবার তোমাদের স্মৃতিপটে আনিয়া দিতে চাই। রাজপুতানার সমস্ত হিন্দুরাজারা ক্ষাত্রধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়ে যখন একে একে দিল্লীর তাতার বাদশাহের অধীনতা স্বীকার করেন, তখন কেবল মেবারই স্বাধীন ছিল। বাপ্পা রাবলের পুত্র তুরস্কের পদরেণু মস্তকে ধারণ করে নাই। যেদিন থানেশ্বরের রণক্ষেত্রে 'যোগীন্দ্র' সমর সিংহের শূলদণ্ড ভগ্ন হইয়াছিল, যেদিন সেই কালসংগ্রামে মেবারের বীরগণ 'রাভীর' লৌহ তরঙ্গে শায়িত হইয়াছিলেন, যেদিন আশ্রয় বিহীন হিন্দু কুলবালা দুরন্ত তাতারের হস্তে অবমাননার ভয়ে প্রথমে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিতে শিখিয়াছিলেন, সেইদিন হইতেই মেবারের জীবন একটি মহাবিস্তৃত যুদ্ধক্ষেত্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দিল্লীর তাতাররাজ এই পুরাতন হিন্দু রাজ্যকে বিলুপ্ত করিতে কতই না চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সমস্ত ভারতবর্ষের একত্রিত বাহুবল, সমস্ত ভারতবর্ষের একত্রিত চেষ্টা, রণবিশারদ আকবরের সমর কৌশল সহস্রধারে এই ক্ষুদ্র রাজপুত রাজ্যের উপর বারে বারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। বারে বারে সেই সমস্ত বল-তরঙ্গরাশি মেবারের দুর্জয় হৃদয় হইতে মেবারের দুর্দমনীয় 'রাজপুতী' হইতে প্রতিহত হইয়া অবশেষে ঢলিয়া পড়িয়াছিল। ক্রমে উদয় সিংহ মেবারের সিংহাসনে আরূঢ় হইলেন। উদয় সিংহ ভীরু কাপুরুষ ছিলেন। ক্রোধ প্রজ্বলিত নয়নে আমার দিকে চাহিও না—মহারাণা অমর সিংহ! তোমার পিতামহ ভীরু কাপুরুষ ছিলেন। সেই সময়ে মেবারের দুর্জয় হৃদয়, মেবারের ত্রিভুবনজয়ী 'রাজপুতী' ঝালো জয় সিংহের সহিত বীর কুলর্ষভ প্রতাপ চান্দাবতের সহিত চিতোরের 'সূর্য্যপোলে' অনন্ত রুধির তরঙ্গে ডুবিয়া গেল। রাজপুত কুললক্ষ্মী জগন্মাতা ভীমা 'চিতোর রাণী' চিতোরের প্রাচীরে তাঁহার প্রিয়তম মন্দির

ত্যাগ করিয়া মোগল তোপের অগ্রে পলায়ন করিলেন। হিন্দুর সূর্য অস্তাচলে গমন করিল, ভারত গগন নিবিড় মেঘে আচ্ছন্ন হইল। কিন্তু দুঃখের আতিশয্য সময়েই বিধাতা মুখ তুলিয়া চাহেন। নিবিড় ঘনঘটায় আচ্ছন্ন দিগন্ত মধ্যে বালক প্রতাপ সিংহের তেজোময় 'দো-ধারা' চমকিতেছে। বাল মার্তণ্ডের ন্যায় যুবা প্রতাপসিংহের যশোরাশি দিগন্ত অতিক্রম করিয়া মধ্য গগনে বিভাসমান হইল। হলদীঘাটে প্রতাপসিংহের সূর্য 'চান্দী' অস্তোমানোন্মুখ হইল। প্রতাপ ভগ্ন মন লইয়া পর্বতে উঠিলেন, তখনও পরাজয় স্বীকার করিলেন না। এক স্থিরপ্রতিজ্ঞ অজেয় হৃদয়ের সমক্ষে অসংখ্য বলরাশি পরাভূত হইল। সুন্দর মাতৃভুমি বীর পুরুষের আবাসভূমি বিধর্মী ছারখার করিতেছে দেখিয়া প্রতাপের হৃদয় দ্বেষ ও হিংসায় আপ্লুত হইতে লাগিল। তাতার সম্রাট এই অজেয় শত্রুকে মনে মনে সম্মান করিতে শিখিলেন। রণ ক্ষান্ত হইল। কিন্তু সেই মহাসমরে প্রতাপের শরীর ভগ্ন হইয়াছিল। প্রতাপ পরলোকে গমন করিলেন। প্রতাপ পরলোকে গমন করিয়াছেন কিন্তু যশোরাশি এখনও ত্রিভুবন ব্যাপিয়া রহিয়াছে। কে বলে হিন্দুর ইতিহাস নাই? কে বলে হিন্দুর গৌরব করিবার কিছুই নাই? হিন্দুর ইতিহাস, হিন্দুর গৌরব, হিন্দুর বীরপনা, হিন্দুর মাহাত্ম্য পর্বতে পর্বতে, প্রকৃতির বিশালতম স্তম্ভসমূহে—এই সমস্ত গগনস্পর্শী প্রাচীরে—অনন্ত কালের তরে অঙ্কিত রহিয়াছে। বিশ্ব পূজিত আর্য্য জাতির পুনরাবির্ভাবের সময়ে জগৎ তাহা বুঝিতে পারিবে। এইক্ষণে জগৎ তাহা বুঝিতে পারিবে। এইক্ষণে আমাদের পুনর্জন্মের সময় উপস্থিত। অমর সিংহ! মহারাণা! তুমিই সেই পুনর্জন্ম ঘটাইবে। অতএব অগ্রসর! শান্তি? শান্তি? অমর রাণা ক্ষান্ত হও। পিতার চিরজয়ী অসি পাইয়াছ—শান্তি সেই অসির আগায়! সন্ধি? কেন? মোগল কি রাবলার দ্বারে? আর যদি তাই হয়, ভীরু! রাজপুতের ন্যায় অসি হস্তে মরিতে জানো না? অতএব

বীরবৃন্দ অগ্রসর! যে এই রণে পরাঙ্মুখ সে পরাধীন,—রাজপুত নহে।"

এ যেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের উন্মাদনা সৃষ্টি! যোগীশ্বরের মুখে যেন প্রমথনাথই কথা বলছেন, স্বাধীনতা যুদ্ধে বীরবৃন্দকে উত্তেজিত করছেন।

প্রমথনাথ মনেপ্রাণে ছিলেন বিপ্লববাদী। ইংরেজের সঙ্গে আপোষ ক'রে ভারতবাসীর জন্য কিছু সুবিধা-সুযোগ তার কাম্য ছিল না। তাই ইতিহাস খুঁজে তিনি ইতিহাসের প্রথম শহীদ নন্দকুমারকে স্মরণ করেছেন। তাঁর আগে এ কার্য আর কেহ করেন নাই। মহারাজ নন্দকুমারই সর্ব্বপ্রথম ভারতীয় যিনি ইংরেজ রাজত্বের প্রথম দিকে ইংরেজের বিরোধিতা ক'রে ফাঁসিকাষ্ঠে শহীদের মৃত্যু বরণ করেছেন। ১৯০৬ খৃঃ প্রথম প্রমথনাথ Trial of Maharaj Nund Kumar পুস্তক প্রকাশ করেন। বইখানি সুপ্রিম কোর্টে নন্দকুমারের মামলায় হুবহু কার্য বিবরণী। ইহাতে প্রমথনাথের একাধারে ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও বিপ্লবীমনের পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রমথনাথের রাজনৈতিক মতবাদ ছিল প্রগতিশীল। জাতির আত্মশক্তিতে তাঁর বিশ্বাস ছিল অপরিসীম। তাই স্বাধীনতা সংগ্রামে সশস্ত্র বিপ্লবই ছিল তাঁর নিকট একমাত্র পথ। ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস যখন প্রতিষ্ঠিত হয় প্রমথনাথ তখন ৩২ বৎসরের যুবক, খ্যাতিমান ব্যারিষ্টার। কংগ্রেসের নেতা হবার মত সমস্ত গুণই তাঁর মধ্যে ছিল। বিশেষ করে কংগ্রেসের একচ্ছত্র নেতা সুরেন্দ্রনাথ তাঁর বন্ধু। সুতরাং নেতা হবার সব রকম সুযোগই তাঁর ছিল। কিন্তু আসলে সেদিনের কংগ্রেসের আবেদন নিবেদনের নীতিতে তাঁর আদৌ বিশ্বাস ছিল না। স্বাধীনতা কেউ কাউকে দেয় ইহা তিনি কোন দিনই সম্ভব বলে মনে করতেন না। ইংরেজ আমাদিগকে স্বাধীনতা দিতে পারে একথা শুনলে তিনি হেসেই

উড়িয়ে দিতেন। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ জাতি সম্পর্কে প্রমথনাথ বলতেন, "যে জাতির সাম্রাজ্য বিস্তারের ক্ষুধা এতকাল পরেও মিটেনি সেই জাতি তার সুবিস্তৃত সাম্রাজ্যের এক বিশাল অংশ ভারতবর্ষকে শাসনবন্ধন ও শোষণ-পাশ থেকে বিনা সংগ্রামে স্বেচ্ছায় মুক্তি দিবে, এরূপ কখনও আশা করা যেতে পারে না।"

সেদিনের কংগ্রেস নেতারা পূর্ণ স্বাধীনতার কথা বলতেন না। স্বরাজ, স্বায়ত্ত-শাসন প্রভৃতি কথার আড়ালে ইংরেজের কাছে এটা সেটা কিছু সুবিধা-সুযোগ চাইতেন মাত্র। কিন্তু প্রমথনাথের আদর্শ ও লক্ষ্য ছিল পূর্ণ স্বাধীনতা। এবিষয়ে অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে প্রমথনাথের মতের মিল ছিল। অরবিন্দ কংগ্রেসের নেতা হয়েও, কংগ্রেসের মধ্যে থেকেও সেদিনের কংগ্রেসের ভিক্ষানীতির বিরোধী ছিলেন। উভয়েই পূর্ণস্বাধীনতা চাইতেন এবং এজন্য বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতির মাধ্যমে সশস্ত্র বিপ্লবের প্রস্তুতি সমর্থন করতেন। অরবিন্দ এজন্য সংবাদপত্র, সভাসমিতির এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের সাহায্য গ্রহণ কিছুটা সমর্থন করতেন। কিন্তু পি. মিত্র বলতেন, একমাত্র গোপন পথ ভিন্ন স্বাধীনতার সংগ্রামে সশস্ত্র প্রস্তুতি সম্ভব নয়। তবে উভয়ই এসম্বন্ধে একমত ছিলেন যে, ভারত তার চিরন্তন আধ্যাত্মিকতার পথেই আত্মশক্তি ফিরে পাবে, আধ্যাত্মিক জীবনের পুণঃ প্রতিষ্ঠার উপরই ভারতের ভবিষ্যৎ শক্তি নির্ভর করছে। বিপ্লবী মতও পথের দিক থেকে উভয়ের মধ্যে এই মিল ছিল ব'লেই অনুশীলন সমিতির মধ্যে উভয়ে মিলিত হয়েছিলেন।

৩য় পরিচ্ছেদ

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ী ছিল সে যুগের কলকাতা এবং বাংলাদেশের সংস্কৃতিকেন্দ্র। কি ইংরেজী ভাবধারা প্রচারে, কি স্বাদেশিকতা বা স্বাজাত্য বোধ সৃষ্টিতে ঠাকুরবাড়ীর এক বিশিষ্ট স্থান ছিল। কলকাতার সর্বপ্রকার আন্দোলনে এবাড়ীর নেতৃত্ব ছিল।

স্বদেশী শিল্পের উন্নতি, সাহিত্যের বিকাশ, সঙ্গীতাদির অনুশীলন, স্বদেশীয় ব্যায়াম কুস্তী প্রভৃতির পুনর্বিকাশের প্রয়োজনীয়তা এখানে বসেই প্রথম অনুভূত হয়। এজন্য একটি সংস্থা গঠিত হয়। নাম—হিন্দুমেলা বা জাতীয় মেলা। সংস্থার সম্পাদক ছিলেন নবগোপাল মিত্র। ১৮৬৭ সালের ৩০ চৈত্র মেলার প্রথম অধিবেশন হয় বেলগাছিয়ার বাগানে। এখানে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত—"গাও ভারতের জয়" গানটি প্রথম গীত হয়। এই গানই ভারতের প্রথম জাতীয় সঙ্গীত। অধিবেশনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়—ভারতীয়দের আত্মনির্ভর করে তোলাই মেলার উদ্দেশ্য। সেদিনের কলকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ—রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর, রমানাথ ঠাকুর, দিগম্বর মিত্র দুর্গাচরণ লাহা, প্যারী চরণ সরকার, গিরিশ চন্দ্র ঘোষ, কৃষ্ণদাস পাল, যতীন্দ্র নাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর, প্রভৃতি মেলায় বিভিন্ন বিভাগ পরিচালনার ভার নিয়েছিলেন। জাতীয় জীবন সংগঠনকল্পে সম্মিলিত প্রচেষ্টা এই প্রথম। এর মূল লক্ষ্য ছিল ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ।

কিন্তু নবজাগ্রত শিক্ষিত যুবকদল এই দীর্ঘকালীন কর্মসূচী মেনে দেশকে স্বাধীন করবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। নব্য বাঙালী তখন দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ, পরাধীন জীবন তার কাছে দুঃসহ। বন্ধনের শক্ত নাগপাশ নিমেষে ছিন্ন করে জগতের অপরাপর স্বাধীন জাতির সঙ্গে সমান আসনে বসবার জন্য সে দৃঢ়সংকল্প। দেশের সামগ্রিক উন্নতির জন্য শাসনক্ষমতা হাতে নেওয়া প্রয়োজন—এটা বাঙ্গালী নিঃসংশয়ে বুঝে নিয়েছে তখন। ফরাসী বিপ্লবের বাণী তার কর্ণে পৌঁছে গিয়েছে। ইতালীর ম্যাটসিনি ও গ্যারিবল্ডীর সঙ্গেও তার পরিচয় হয়েছে। তাঁদের কারবোনারি আন্দোলনও বাঙ্গালীর কাছে অপরিচিত নয়। তাই জাতীয় মেলার প্রতি যুবকশ্রেণীর কোন আকর্ষণ জন্মেনি। বাঙ্গালী স্বাধীনতার জন্য ধরল অন্য পথ—সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে সশস্ত্র সংগ্রামের পথ। এই উদ্দেশ্যে

জাতীয় মেলা প্রতিষ্ঠার নয় বৎসর পরে এই ঠাকুরবাড়ীতেই প্রতিষ্ঠিত হল সঞ্জীবনী সভা—প্রথম গোপন সমিতি। এ বিষয়ে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন ঋষি রাজনারায়ণ বসু। সমিতির সভ্যদের গোপন ভাষায় এর নাম ছিল 'হানচু পামু হাফ'। এখানেই আরম্ভ হল তরুণদের মন্ত্রগুপ্তির অভ্যাস।

ঠাকুরবাড়ীর এই সঞ্জীবনী সভা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে লিখেছেন—"জ্যোতি দাদার উদ্যোগে আমাদের একটি সভা হইয়াছিল, বৃদ্ধ রাজনারায়ণ ছিলেন তাহার সভাপতি। ইহা স্বদেশীদের দল। কলিকাতার এক পোড়ো বাড়ীতে সেই সভা বসিত। সভার সকল অনুষ্ঠান রহস্যাবৃত ছিল।"

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এ সম্পর্কে লিখেছেন—"সভার নিয়মাবলী অনেকই ছিল, তার মধ্যে প্রধান ছিল মন্ত্রগুপ্তি। অর্থাৎ এ সভায় যাহা কথিত হইবে, যাহা কৃত হইবে এবং যাহা শ্রুত হইবে, তা' অ-সভ্যদের নিকট প্রকাশ করিবার অধিকার কাহারও থাকিবে না। ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকাগার হইতে লালরেশম জড়ানো বেদমন্ত্রের একখানা পুঁথি এই সভায় আনিয়া রাখা হইয়াছিল। টেবিলের দুই পাশে দুইটি মড়ার মাথা থাকিত, তাহার দুইটি চক্ষু কোটরে দুইটি মোমবাতি বসানো ছিল। মড়ার মাথাটি মৃত ভারতের সাঙ্কেতিক চিহ্ন। বাতি দুইটি জ্বালাইবার অর্থ এই যে, মৃত ভারতে প্রাণ সঞ্চার করিতে হইবে ও তাহার জ্ঞান-চক্ষু ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। সভার প্রারম্ভে বেদমন্ত্র গীত হইত—'সংগচ্ছধ্বম্, সংবদধ্বম্।' ইহার দীক্ষানুষ্ঠানে এক ভীষণ গাম্ভীর্য্য ছিল। দীক্ষাকালে দীক্ষার্থীর সর্বাঙ্গ অদ্ভুত ভাবাবেগে শিহরিয়া উঠিত।"

যে পোড়ো বাড়ীতে সভা বসত তার অবস্থিতি ছিল ঠনঠনিয়া অঞ্চলে। বাড়ীর মালিক কে তা' কেউ জানতো না।

সভার কার্য বিবরণী জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উদ্ভাবিত এক গুপ্ত ভাষায় লেখা হত। ঐ ভাষায় সঞ্জীবনী সভার নাম ছিল—হান্‌চু পামু হাফ।

কলকাতায় সকল কিছু আন্দোলনের কেন্দ্র ব'লেই জোড়া-সাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে প্রমথনাথেরও যাতায়াত ছিল এবং সেই সূত্রে সঞ্জীবনী সভার সঙ্গেও তাঁর সংযোগ ছিল।

১৯০২ খৃঃ অব্দে আমেরিকার ধর্ম মহাসভার মত জাপানেও একটি ধর্মমহাসভা আহূত হয় এবং সেখানে স্বামী বিবেকানন্দ নিমন্ত্রিত হন। স্বামীজীকে নিয়ে যাবার জন্য ১৯০১ সালের ডিসেম্বর মাসে মহাসভার পক্ষ থেকে জাপানী চিত্রশিল্পী কাকাসু ওকাকুরাকে পাঠানো হয়। তাঁর সঙ্গে এসেছিল য়েভারেণ্ড ওডা। স্বামীজী অসুস্থ ছিলেন ব'লে তাঁর জাপান যাওয়া সম্ভব হয়নি। ওকাকুরা স্বামীজীর আমেরিকান শিষ্যা শ্রীমতী ম্যাকলাউডের সঙ্গে কিছুদিন বেলুড় মঠে অবস্থান করেন। এই সময়ে ওকাকুরা 'Ideals of the East' নামে একখানি পুস্তক লিখছিলেন। ভগিনী নিবেদিতা এর পাণ্ডুলিপি সংশোধন করে একটি মুখবন্ধ লিখে দেন। পুস্তকে ওকাকুরা বলেছেন যে, সমগ্র এশিয়ার কৃষ্টি এক। এশিয়ার প্রায় সব দেশই পাশ্চাত্য আধিপত্যের বিরোধী। ভারতকে তারা এই এশিয়াসমন্বয়ের মধ্যে চাইছে। বেলুড় মঠে অবস্থানকালে ওকাকুরা ভগিনী নিবেদিতাকে সঙ্গে নিয়ে বুদ্ধগয়া প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করেন।

কলকাতায় ঠাকুরবাড়ীতে ওকাকুরার সম্বর্ধনার এক ব্যবস্থা হয়। এই উপলক্ষে ওকাকুরা এদেশীয় সাহিত্যিকদের সঙ্গে মিলিত হবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সাহিত্যিক সমাবেশ আয়োজনের ভার পড়ে প্রমথনাথ এবং তেঘরিয়ার শশীভূষণ রায় চৌধুরীর উপর। তরুণ কবি দ্বিজেন্দ্রলাল থেকে প্রাচীন সাহিত্যিক যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি অনেকেই সম্বর্ধনা সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় ওকাকুরা ভারতের পরাধীনতার জন্য উপস্থিত মনিষীদের সকলকে বিশেষভাবে ভারতীয় সাহিত্যিকদের মৃদু ভৎসনা করেন। তিনি তাঁদের জিজ্ঞাসা করেন—ভারতের অতীত মহান ও ঐতিহ্যপূর্ণ। অতীতে ভারত এশিয়াখণ্ডে একদিন শিক্ষকের

আসনে আসীন ছিল। কিন্তু আজ সে পরাধীনতার হীনতা সহ্য করছে কেন? এই পরাধীনতা মোচনে ভারতের মনীষিগণ এবং সাহিত্যিকগণ আজ নিশ্চেষ্ট কেন? এই মৃদু তিরস্কার সেদিন আর কারও হৃদয় স্পর্শ করেনি কিন্তু প্রমথনাথকে স্পর্শ করেছিল। সভান্তে তিনি এবিষয় নিয়ে ওকাকুরার সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করেন।

ঠাকুরবাড়ীর সেদিনের বৈঠক থেকে প্রমথনাথ এক নূতন সংকল্প নিয়ে গৃহে ফিরলেন। তিনি স্থির করলেন, পরাধীনতার কলঙ্ক যেকোনরূপে মোচন করতেই হবে। স্বজাতিকে পাশ্চাত্য জাতিসমূহের সমকক্ষ করাই হল সেদিন থেকে তাঁর লক্ষ্য।

জাতির শৃঙ্খল মোচনের জন্য শক্তি চর্চার প্রয়োজনীয়তা পূর্ব থেকেই তিনি অনুভব করছিলেন। এবারে জাতীয় জীবনে এই শক্তিচর্চাকে প্রতিষ্ঠিত করবার সুযোগ অন্বেষণ করতে লাগলেন। সুযোগ মিলতে বিলম্ব হল না। তেঘরিয়ার শশীভূষণ রায়চৌধুরীর কথা আগেই বলা হয়েছে। একদিন জেনারেল এসেম্বলী কলেজ বর্ত্তমানে স্কটিশ চার্চ কলেজের ছাত্র সতীশ চন্দ্র বসু তাঁকে জানাল, মদন মিত্র লেনে তারা একটা লাঠি খেলার ক্লাব খুলেছে, একজন উপযুক্ত সভাপতি স্থির করে দিতে হবে। শশীবাবু যুবকদের ব্যারিষ্টার আশুতোষ চৌধুরীর নিকট নিয়ে যান। আশুতোষবাবু সমস্ত শুনে বললেন, একাজের উপযুক্ত লোক হচ্ছেন ব্যারিষ্টার প্রমথনাথ মিত্র। তিনি প্রমথনাথের নিকট এক পত্র দিয়ে যুবকদের পাঠিয়ে দেন। সতীশচন্দ্র গিয়ে তাঁকে সব কথা জানালে তিনি আনন্দের আতিশয্যে উত্তেজিত হয়ে সতীশচন্দ্রকে জড়িয়ে ধরলেন। এতদিন তিনি এই সুযোগই খুঁজছিলেন। আজ সে সুযোগ মিলেছে। অল্পদিনের মধ্যেই প্রমথনাথ সতীশচন্দ্রের প্রতিভার পরিচয় পেলেন। স্বাধীনতা অর্জনে এবং জীবনের ব্রত সাধনে সতীশচন্দ্র পেলেন উপযুক্ত নেতা এবং প্রমথনাথ পেলেন উপযুক্ত শিষ্য ও কর্মী। অনুশীলন সমিতির উদ্ভব এবং প্রতিষ্ঠা এরই ফল।

স্বামী বিবেকানন্দ জগন্মাতার নিকট যুবকদের প্রার্থনা করতে বলেছিলেন—"জগদম্বে! আমায় মনুষ্যত্ব দাও, মা আমার কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।" স্বামীজী সেদিন এ প্রার্থনা করতে বলেছিলেন সমগ্র বাঙ্গালী জাতিকে। প্রথমনাথ এবং সতীশচন্দ্র সেই কর্মভারই গ্রহণ করলেন। বাঙ্গালী জাতিকে বীর্যবান এবং আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী করে তুলবার ভার নিলেন তাঁরা।

১৯০২ সালের দোল পূর্ণিমার দিন বাংলা ১০ই চৈত্র, ১৩০৮ সাল, সোমবার, ইংরেজী ২৪শে মার্চ অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠা দিন। হেদুয়ার নিকট মদন মিত্র লেনে এর ব্যায়ামাগার পূর্বেই সতীশচন্দ্রের উদ্যোগে স্থাপিত হয়েছিল। এবারে এর কাছেই একটি ছোট বাড়ীতে সমিতির কার্য্যালয় স্থাপিত হল। তিন বৎসর পরে ১৯০৫ সালে নূতন কার্য্যালয় হল ৪৯ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন তত্ত্বে শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সমন্বিত আদর্শ মানবগঠনের যে নির্দেশ আছে, তাই অনুশীলন সমিতির এই বড় ভিত্তি। বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্বে শেষ উপদেশ—"সকল ধর্মের উপরে স্বদেশপ্রীতি, ইহা বিস্মৃত হইও না।" এই বাণীই ছিল অনুশীলন সমিতির মূল প্রেরণা। নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুলের প্রধান শিক্ষক নরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সংস্থার নামকরণ করেছিলেন ভারত অনুশীলন সমিতি। প্রমথনাথ একে সংক্ষিপ্ত করে অনুশীলন সমিতি নাম দেন।

লাঠি খেলার ন্যায় সমিতির এই নামকরণ ব্যাপারেও প্রমথনাথ বঙ্কিমচন্দ্র দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। বয়সে প্রায় ১৫ বছরের ব্যবধান সত্ত্বেও দুজনে প্রায় বন্ধুর মতই মেলামেশা করতেন। এই পারস্পরিক বন্ধুত্ব বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। আনন্দমঠের 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীত রচনার পরে বঙ্কিমচন্দ্র ইহার পাণ্ডুলিপি নিয়ে মিত্রগৃহে এসেছিলেন তরুণ বন্ধুকে শুনাবার জন্য। উভয়ের মধ্যে বহুক্ষণ আলোচনা হল,

পড়তে পড়তে উভয়ে ভাবাবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। বঙ্কিমচন্দ্র উচ্চৈস্বরে বলে উঠলেন—"এমন একদিন আসবে যেদিন সমগ্র ভারতে 'বন্দেমাতরম' গীত হবে"। বঙ্কিমচন্দ্র সেদিন দেখে যাননি কিন্তু প্রমথনাথ দেখেছিলেন।

সতীশ চন্দ্রের অনুরোধে প্রমথনাথ সমিতির অধিনায়ক হতে সম্মত হয়েছিলেন। কিন্তু সমিতি প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই তিনি এর সভাপতি নির্বাচিত হন। সহ-সভাপতি হন চিত্তরঞ্জন দাস। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর কোষাধ্যক্ষ হলেন। পরে অরবিন্দও সহ-সভাপতি হন। সমিতির প্রথম যুগের নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে ভগিনী নিবেদিতাও ছিলেন। নিবেদিতা জীবনীকার ফরাসী মহিলা মাদাম হার্বাট বলেন, অনুশীলন সমিতির ৫ জন ট্রাষ্টির মধ্যে নিবেদিতাও ছিলেন একজন। একথা অরবিন্দও অনুমোদন করেছেন।

সভাপতি প্রমথনাথই সমিতির আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি স্বয়ং মাসিক ৩০ টাকা করে দিতেন। এছাড়া অন্যান্য ব্যারিষ্টারদের নিকট থেকে অর্থ সংগ্রহ করে দিতেন। বারীন্দ্র কুমার বলেন, "উকিল হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আদি দু'চারজন দিতেন ১০ টাকা করে; আর বাদবাকী সুরেন হালদার, রজত রায় প্রভৃতি জুনিয়র ব্যারিষ্টাররা দিতেন মাসিক ৫ টাকা হিসাবে। এছাড়া জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়, এইচ. ডি. বসু প্রমুখ ব্যারিষ্টারগণও সমিতিকে অর্থ সাহায্য করতেন। প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী রাসবিহারী ঘোষ এবং বিচারপতি সারদা চরণ মিত্রের নিকট থেকে কখনও কখনও সাহায্য পাওয়া যেত।

অনুশীলন সমিতির আদর্শ ছিল 'পূর্ণ মনুষ্যত্বে পৌছানো', উদ্দেশ্য ছিল 'জগদ্ধিতায় কর্ম্ম' লক্ষ্য ছিল পূর্ণ মনুষ্যত্বে পৌছানের জন্য পথের সকল বাধাবিঘ্ন অপসারণ।

পূর্ণ মনুষ্যত্বে পৌছানো বলতে বুঝায় যে মানুষের শারীরিকী, মানসিকী, জ্ঞানার্জনী ও চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির পূর্ণাভিব্যক্তি ও বিকাশের

পথে এগিয়ে চলতে হবে। এজন্য সমিতি মানুষ গড়ার কর্ম্মসূচী গ্রহণ করেছিল।

অনুশীলন সমিতির মতে আমাদের পূর্ণাভিব্যক্তি বা বিকাশের পথে প্রধান বাধা পরাধীনতা। এইজন্য স্বাধীনতা অর্জন ছিল সমিতির প্রধান লক্ষ্য। এই কারণে ভারত থেকে বৃটিশ শাসনের উচ্ছেদসাধন মানসে এক সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্য সমগ্র ভারত-ব্যাপী সংগঠন গড়ে উঠেছিল পরবর্তীকালে। পি. মিত্র বাংলাদেশ ব্যাপী শক্তিশালী সংগঠন দেখে গিয়েছেন।

প্রমথনাথের সুপরিচালনাগুণে অনুশীলন সমিতি অল্পদিনের মধ্যেই প্রতিষ্ঠা লাভ করল। সমিতির উচ্চ আদর্শে আকৃষ্ট হয়ে দলে দলে যুবক এর সভ্য হতে লাগল। সমিতি দেশের নেতৃবৃন্দেরও প্রশংসা অর্জন করল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিন চন্দ্র পাল প্রভৃতিও সমিতির সংস্পর্শে এসেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে এসে নিজের সুললিত কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে সমিতির সদস্যদের উৎসাহ বৃদ্ধি করতেন। ভগিনী নিবেদিতা এসে মাঝে মাঝে উপদেশ দিতেন এবং যুবকদের দেশোদ্ধারে উদ্দীপিত করতেন। রামকৃষ্ণ মিশনের রাখাল মহারাজ, স্বামী সারদানন্দ প্রভৃতি এসে নীতি শিক্ষা দিতেন।

এইভাবে সমিতির দ্রুত প্রসার হতে লাগল। কলকাতায় বিভিন্ন পল্লীতে এবং শহরের উপকণ্ঠেও সমিতির শাখা-প্রশাখা প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল। প্রথমদিকে সমিতির কোন বিধিবদ্ধ নিয়মশৃঙ্খলা ছিল না। একমাত্র স্নেহের বন্ধনেই পরস্পর আকৃষ্ট ছিল। পারস্পরিক আকর্ষণের মধ্য দিয়াই ক্রমে সমিতিতে নিয়মানুবর্হিতা গড়ে উঠল। স্বাধীনতা অর্জনের জন্য একদিন সমিতিকে বৃটিশ শাসনের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হবে। স্বেচ্ছায় ইংরেজ এ দেশ ছেড়ে যাবে না। এই ধারণার বশবর্ত্তী হয়েই সমিতির কর্মসূচী রূপায়িত হয়।

সমিতির সদস্যদের শারীরিক উন্নতির জন্য সমিতিতে ডন,

বৈঠক, কুস্তী প্রভৃতির ব্যবস্থা ছিল। ফুটবল এবং অন্যান্য বিদেশী খেলা সম্পূর্ণ বর্জিত ছিল। হাডুডু প্রভৃতি দেশীয় খেলার উৎসাহ দেওয়া হত। প্রমথনাথের ন্যায় সতীশ চন্দ্রও লাঠি খেলায় উৎসাহী ছিলেন। মিত্র সাহেবের সঙ্গে পরিচয়ের পূর্বেই তিনি মদন মিত্র লেনের আখড়ায় ছোট লাঠি খেলা প্রবর্ত্তন করেছিলেন। অনুশীলন সমিতিতে প্রথম থেকেই লাঠিখেলার ব্যবস্থা ছিল। শুধু তাই নয়, সমিতির চেষ্টায় অল্পদিনের মধ্যেই কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে লাঠিখেলা জনপ্রিয় হয়ে উঠল। সমিতিতে ছোরাখেলা, তরবারিযুদ্ধ, মুষ্টিযুদ্ধ, যুযুৎসু প্রভৃতিও শিক্ষা দেওয়া হত। সামরিক কায়দায় ড্রিল এবং কখনও কখনও কৃত্রিম যুদ্ধের অনুষ্ঠানও হত। নির্ব্বাচিত বিশিষ্ট সদস্যদের গোপনে আগ্নেয়াস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হত। নৌকা পরিচালনা এবং অশ্বারোহণ শিক্ষারও ব্যবস্থা ছিল। এজন্য সমিতিতে একটি ঘোড়া কেনা হয়েছিল। মাঝে মাঝে গঙ্গাবক্ষে সন্তরণের প্রতিযোগিতা হত। শ্রীরামপুরের মার্তাজা সাহেব এসে বড় লাঠি ও তরবারি শিক্ষা দিতেন। সমিতির সদস্যদের মধ্যে অতুল ঘোষ বড় লাঠিতে, যাদুগোপাল মুখার্জী ছোট লাঠি, ছোরা এবং অসি খেলায়, নগেন দত্ত ও সুরদাস ভাদুড়ী মুষ্টিযুদ্ধে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জ্জন করেছিলেন।

সমিতির সদস্যদের নৈতিক উন্নতির জন্য নানারূপ ব্যবস্থা ছিল। দেশ-বিদেশের উৎকৃষ্ট গ্রন্থাবলী পাঠে উৎসাহ দেওয়া হত। বীর পুরুষদের জীবন চরিত, বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতার সংগ্রাম কাহিনী সমিতিতে পঠিত হত। এ ছাড়া মারাঠা ও রাজপুত বীরদের জীবনী, ১৮৫৭ খৃঃ অব্দের ভারতব্যাপী বিদ্রোহের ইতিহাস, ম্যাটসিনি ও গ্যারীবল্ডীর জীবন চরিত সমিতিতে পঠিত হত। রাজনীতি, অর্থ-নীতি, দেশের কথা প্রভৃতি সম্পর্কে সমিতিতে নিয়মিত আলোচনা হত। সমিতির সদস্য সখারাম গণেশ দেউস্কর এজন্য প্রভূত পরিশ্রম ক'রে তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'দেশের কথা' রচনা করেছিলেন।

সমিতির নিজস্ব পাঠাগারের পুস্তক সংখ্যা ছিল প্রায় ৪০০০।

পাঠাগারের নাম ছিল ন্যাশনাল লাইব্রেরী বা জাতীয় পাঠাগার। ভগিনী নিবেদিতা তাঁর সংগৃহীত প্রায় ২০০ মূল্যবান পুস্তক এই পাঠাগারে দান করেছিলেন। সমাজতন্ত্র, ইতিহাস, রাজনীতি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি ক্লাশ করে শিক্ষা দেওয়া হত। নৈতিক উন্নতির জন্য প্রতি শনি ও রবিবারে Moral ক্লাস হত। এই ক্লাসে রামায়ণ, মহাভারত, কথকতা চণ্ডীপাঠ, গীতাপাঠ, ও ব্যাখ্যা হত। কথকতা করতেন হরিদাস হালদার। তিনি রাবণ বধ পালা গাইতেন। ক্লাসে স্বদেশ বন্দনা, ধর্মসঙ্গীতও গীত হত। সমিতির সদস্য অমৃতলাল গুপ্ত প্রথমে গান আরম্ভ করতেন। অন্য সকলে সুর মিলিয়ে গাইতেন। বীরোচিত সুরধ্বনির সঙ্গে 'বন্দেমাতরম সঙ্গীত' ও গীত হত।

সমিতির সদস্যদের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য নানারূপ উপদেশ ও সাধনপদ্ধতির ব্যবস্থা ছিল। সংযম শিক্ষা ও ব্রহ্মচর্য্য পালন সম্পর্কে উপদেশ দিতেন সত্যচরণ শাস্ত্রী, শরৎ মহারাজ (স্বামী সারদানন্দ), ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রভৃতি। বেদ উপনিষদে অমৃতের সন্ধান, মরণভয় জয়ী হওয়া, আত্মজ্ঞানে এবং মানব জীবনের রহস্য সম্পর্কে এরা সমিতির সদস্যদের জ্ঞানলাভে সাহায্য করতেন। ব্যায়াম ও নৈতিক ক্লাসে যোগদান সদস্যদের পক্ষে বাধ্যতামূলক ছিল।

অনুশীলন সমিতি ছিল যেন একটা যৌথ পরিবার। সমিতিতে এবং সমিতির বাইরেও কে কি করছে তা' সমিতি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হত। কাহারও অসুখ করলে সে সমিতির অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত থাকলে তার সন্ধান নিয়ে পরিচর্য্যার ও সেবার ব্যবস্থা করা হত। গুপ্ত কার্য্যের জন্য যে সকল সদস্য নির্দিষ্ট হত তাদের কালীমন্দিরে নিয়ে দীক্ষা দেওয়া হত। দেবীর সম্মুখে নিজ অঙ্গুলির অগ্রভাগ কেটে এবং বুকের রক্ত দিয়ে প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করতে হত। প্রতিজ্ঞার মর্ম এই ছিল যে, দীক্ষাপ্রাপ্ত সদস্য কোন মন্ত্রণা বা তথ্য কাহারও নিকট প্রকাশ করবে না। সমিতির কোন সদস্য অপর

কোন সদস্যকে প্রতারণা করবে না। কেহ সমিতির বিরুদ্ধাচরণ করবে না। কেহ রাজশক্তির গুপ্তচর বৃত্তি করবে না এবং প্রাণ পর্য্যন্ত পণ ক'রে সমিতির উদ্দেশ্য সিদ্ধির চেষ্টা করবে। একজন সদস্য কি করছে তার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ অপরের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। নবাগত কোন সদস্যের নাম এবং পরিচয় জিজ্ঞাসাও নিষিদ্ধ ছিল।

স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ অনুযায়ী সমিতি নরনারায়ণের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিল। মুষ্টিভিক্ষা প্রভৃতির সাহায্যে চাউল এবং অন্যান্য দ্রব্য সংগ্রহ ক'রে দরিদ্র পরিবারদের সাহায্য করা হত। বন্যা বা দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলে সমিতির সদস্যগণকে সাহায্য ও চিকিৎসার কার্য্যের জন্য প্রেরণ করা হত। অনুশীলন সমিতিই প্রথমে বাংলাদেশে স্বেচ্ছাসেবকপ্রথা প্রবর্ত্তন করেন। বেলুড়মঠের উৎসবে সমিতির সদস্যগণ সমবেত হয়ে সেবা করতেন এবং কাঙ্গালীভোজন পরিচালনা করতেন।

১৯০৬ সালের গ্রীষ্মকালে কলকাতায় শিবাজী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বালগঙ্গাধর তিলক, খাপার্দে, ডাঃ বি. এস. মুঞ্জে প্রভৃতি সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দ এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন। অনুষ্ঠানে পরিচালনার ভার ছিল অনুশীলন সমিতির উপর। সমিতির সদস্যদের সামরিক কুচকাওয়াজ ও শৃঙ্খলা দেখে লোকমান্য তিলক মুগ্ধ হন। তিনি বলেন, "এক সময় ছিল যখন মারাঠারা বাংলাদেশ আক্রমণ করেছিল, কিন্তু আজ যদি বাঙ্গালী যুবকদল মহারাষ্ট্র আক্রমণ করে, তাকে জয়ও করে, আমি বিস্মিত হব না।" ১৯০৮ সালে অর্ধোদয় যোগ উপলক্ষে সমিতির সেবাকার্য্য সকলের প্রশংসা অর্জন করেছিল।

অনুশীলন সমিতিই কলকাতায় সর্বপ্রথম শ্রমজীবী বিদ্যালয় প্রবর্ত্তন করেন। এ-বিষয়ে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন শশীভূষণ রায়চৌধুরী এবং অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। তাঁদেরই উদ্যোগে নিম্নশ্রেণীর নিরক্ষর জনসাধারণের জন্য নৈশ বিদ্যালয় স্থাপিত

হয়েছিল। শিক্ষাব্রতী সুশীল কুমার আচার্য্যের উপর বিদ্যালয়ের পরিচালনার ভার ন্যস্ত ছিল। শরৎচন্দ্র ঘোষ, যতীন্দ্র নাথ শেঠ প্রভৃতি বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে সচেষ্ট ছিলেন। এই বিদ্যালয়ে শিক্ষা পেয়ে এক মুটের ছেলে প্রাথমিক শ্রেণী থেকে আরম্ভ করে বি. এ. পাশ করে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট পর্য্যন্ত হয়েছিলেন। পুত্র যখন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট পিতা তখনও মুটেগিরি করতেন।

জাতিগঠনমূলক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে এই সময় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠিত হয়। পরিষদের সহিত অনুশীলন সমিতির ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। সদস্যদের মধ্যে অনেকে পরিষদের গঠন কার্য্যে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। বিশেষভাবে প্রমথনাথ পরিষদে কর্তৃপক্ষস্থানীয় ছিলেন।

অনুশীলন সমিতির উদ্যোগে এক প্রকার দুর্গোৎসব হত। পূজায় কোন মৃন্ময়ী প্রতিমা ছিল না। দুর্গোৎসব শক্তির আরাধনা এবং অস্ত্রশস্ত্রই প্রকৃত শক্তি। এই ছিল অনুষ্ঠানের অন্তর্নিহিত অর্থ। তাই লাঠি, বর্শা, সড়কি, তরবারি, ছোরা, ভোজালি, খাঁড়া প্রভৃতি সাজিয়ে তারই সাহায্যে দেবীপ্রতিমা গঠন করা হত। পূজায় পুরোহিত আনা হত মহারাষ্ট্র থেকে এবং পূজা হত বেদমন্ত্রে।

সমিতির সদস্যদের মধ্যে 'রামায়ণ' নামক একপ্রকার কথকতা গোপনে অনুষ্ঠিত হত। এর গান ছিল নিম্নরূপ :—

সিংহের দাপটে প্রাণ যায় ওমা,
আনলে কোথা থেকে বিকট পশু ?
দেখে ভয় পাই মা।

দেমা অস্ত্র দয়া করে,
বেটাকে তাড়াই দূরে,
শক্তি পূজা করতে দেখে
ব্যাটা কটমটিয়ে থাকে।
সে তো নাহি মনে ভাবে
আমরা তোর তনয় মা।

বলা বাহুল্য, সিংহ এখানে বৃটিশ সিংহ এবং তাকে তাড়াবার জন্য অর্থাৎ পরাধীনতা থেকে মুক্তির জন্য দেবীর নিকট অস্ত্রশস্ত্র প্রার্থনা করা হচ্ছে।

জেলাজজ বরদা চরণ মিত্র এই সময়ে একটি সঙ্গীত রচনা করেন। গানটি সমিতির বিপ্লবীদের নিকট বিশেষ প্রিয় হয়ে উঠেছিল। এ যেন তাদেরই মনের কথা, তাদেরই বিপ্লবী সংকল্প—

শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত মোরা
অভয়াচরণে নম্র শির।
(আমরা) ডরি না রক্ত ঝরিতে ঝরাতে
দৃপ্ত আমরা ভক্ত বীর।
আবাহন মা'র যুদ্ধ কারণে,
তৃপ্তি তপ্ত রক্ত ক্ষরণে,
পশুবল আর অসুর নিধনে,
মায়ের খড়্গ ব্যগ্রধীর।
মায়ের আরতি অরাতিনাশন,
পদে অঞ্জলি বাঞ্ছা পূরণ,
শত্রুরক্তে মায়ের তর্পণ,
জবার বদলে ছিন্নশির।

সমিতির প্রথম যুগের কর্মীদের মধ্যে সত্য বিনয় মল্লিক, যতীন্দ্র নাথ শেঠ, যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, শরৎ চন্দ্র ঘোষ, প্রিয়ব্রত সরকার, পুলিন বিহারী মুখার্জী, চন্দ্রমাধব সামন্ত, রসিকলাল দত্ত, কালীচরণ সেনগুপ্ত, কামাখ্যা নাথ গুপ্ত, রাধানাথ দে, নেপাল চন্দ্র দত্ত, শৈলেন্দ্র নাথ মিত্র প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্র নাথ বসু এবং অধ্যাপক ল্যাড্লী মোহন মিত্রও অনুশীলন সমিতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সমিতিপ্রতিষ্ঠার অল্পদিন দিন পরে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (স্বামী নিরালম্ব), শ্রীঅরবিন্দ, বারীন্দ্র কুমার প্রভৃতি এসে এর সঙ্গে যুক্ত হন। শ্রীঅরবিন্দ সমিতির অন্যতম

সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী (বাঘাযতীন) এবং নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (মানবেন্দ্র নাথ রায়ও) পরে সমিতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, "যশোহর জেলায় মাগুরা অঞ্চলের অনুশীলনের নেতা হীরালাল রায়, যতীন মুখার্জীকে (বাঘাযতীন) অনুশীলনে এর সঞ্চালক পি. মিত্রের কাছে নিয়ে যান। এর পর থেকে তিনি অনুশীলনের সভ্য হন। রাত্রে রাত্রে তিনি অনুশীলন সমিতির ৪৯নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের অফিসে আরও কিছু পুরানো সভ্যের সঙ্গে মিলিত হতেন। এই জন্য অনুশীলনের সভ্যরা তাঁর সঙ্গে যুক্ত হতে পেরেছিল যেমন, নরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য, হরি কুমার চক্রবর্ত্তী, বীরেন দত্তগুপ্ত, জ্ঞান মিত্র প্রভৃতি।"

৪র্থ পরিচ্ছেদ

শ্রীঅরবিন্দ কিভাবে অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যুক্ত হন এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন—

After I had started my revolutionary work in Bengal through certain emissaries we went there personally to see and arrange things myself. I found a number of groups of revolutionaries that had recently sprung into existence but all scattered and acting without reference to each other. I tried to unite them under a single organisation with barrister P. Mitra as the leader of revolutions in Bengal, and a Central Council of five persons, one of them being Nivedita. The work under P. Mitra spread enormously and finally contained tens of thousands of young men and spirit of re-

revolution spread by Barin's paper 'Yugantar' became general in young generation.

Aurobinda and Mother (P. 15)

'যুগান্তর' প্রকাশ নিয়ে পি. মিত্র এবং বারীন্দ্র কুমারের মধ্যে প্রথম দিকে কিছুটা মতভেদ হয়েছিল। কিন্তু পরে এ ভাব কেটে গিয়েছিল বলে মনে হয়। কারণ অরবিন্দ লিখেছেন—

At Barin's suggestions he (Pramathanath) agreed to the starting of a paper, 'Yugantar' which was to preach open revolt and the absolute denial of British rule in India.

Aurobindo and Mother (P. 44)

বাংলাদেশের এই বিপ্লবীসমিতি সম্পর্কে অরবিন্দ আরও লিখেছেন : Secret society did not include terrorism in its programme but this element grew up in Bengal as a result of the strong repression and the reaction to it in that province.

Aurobindo and Mother (P. 44)

সুতরাং দেখা যায়, সন্ত্রাসবাদ অনুশীলন সমিতির কর্মসূচী ছিল না। সরকারী নিষ্পেষণের ফলে সমিতি আত্মরক্ষা করবার জন্য এই নীতি গ্রহণ করেছিল। অসহযোগপরবর্ত্তীযুগে এটা আবার পরিত্যক্ত হয়।

অনেকের ধারণা, বাংলার বিপ্লব অরবিন্দই মহারাষ্ট্র থেকে নিয়ে এসেছেন। কিন্তু অরবিন্দ নিজেই লিখেছেন যে, তিনি মহারাষ্ট্রবিপ্লবীদলের সংস্পর্শে আসেন বাংলা সংগঠনে যোগ দিবার পরে :—

Later on there was a revolutionary spirit in Maharastra and secret society was started in

Western India with a Rajput prince as the head. This had a Council of five in Bombay with several Maratha Politicians as its members. This society was contacted and joined by Aurobindo somewhere in 1902-3, some days after he had already started secret revolutionary work in Bengal on his own account.

Aurobindo and Mother (P. 15)

মহারাষ্ট্র থেকে বিপ্লবী মনোভাব বাংলাদেশে এসেছে একথা বারীন্দ্র কুমারও বলেন। অথচ অরবিন্দের উপরের লেখা বারীন্দ্রের লিখিত কাহিনীতেই সমর্থিত হয়। বারীন্দ্র কুমারের বরোদা গমনের আগেই যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিপ্লব প্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলায় এসে পি. মিত্রের সঙ্গে অনুশীলন সমিতিতে যুক্ত হন। মারাঠা বিপ্লবী সমিতিতে অরবিন্দের দীক্ষা গ্রহণ এর পরের ঘটনা। বারীন্দ্র কুমার তখন বরোদায় উপস্থিত ছিলেন।

বারীন্দ্র কুমার বলেন, "বরোদায় ঠাকুর সাহেবের গুপ্ত সমিতিতে অরবিন্দের দীক্ষা গ্রহণ আমার চাক্ষুষ ব্যাপার—আমি তখন বরোদায়। একদিন এক যোদ্ধ্‌বেশধারী দীর্ঘকায় পুরুষ অশ্বারোহণে খাসিরাও যাদবের বাড়ীতে এসে হাজির। তাঁকে সসম্মানে প্রত্যুদ্‌গমন করে নিয়ে অরবিন্দ নিভৃত ঘরে দুয়ার দিলেন। আধ ঘন্টা পর সেই রহস্যজনক মানুষটি বাহিরে এসে অরবিন্দের কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। কোমরে তার কোষবদ্ধ অসি লম্বমান।

আমি ইতিপূর্বেই জানতাম অরবিন্দ গুপ্ত সমিতিতে সংযুক্ত আছেন এবং শীঘ্রই তাঁর যথারীতি দীক্ষা হবে। আজকার ঘটনায় আমি সুস্পষ্ট বুঝতে পারলাম, এই ব্যাপারেই আজই তার দীক্ষা গ্রহণ সম্পন্ন হলো। আগেই বলেছি, যতীন্দ্রনাথ আমার ছয় মাস আগেই বরোদার রাজদেহরক্ষীপদে ইস্তফা দিয়ে বাংলায় বিপ্লব সংক্রামিত করার জন্য চলে গিয়েছিলেন।

অগ্নিযুগ (পৃঃ ৩৮)

১৯০২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের কংগ্রেস অধিবেশন বসে আমেদাবাদ নগরে। সভাপতি সুরেন্দ্রনাথ বানার্জি। অরবিন্দের সঙ্গে বারীন্দ্র কুমারও অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। বারীন্দ্রকুমার এর কিছুদিন আগে পূজার ছুটীর অব্যবহিত পরে বরোদায় সেজদার কাছে গিয়েছিলেন। অক্টোবর মাসে নিবেদিতাও বরোদা ভ্রমণ করে, অরবিন্দের সঙ্গে অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠা বিষয়ে আলোচনা করে যান। খুব সম্ভব নভেম্বর মাসে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অরবিন্দের নির্দেশে বরোদা ত্যাগ করে কলকাতা চলে আসেন। আর বারীন্দ্র কুমার বরোদা গিয়ে যতীন্দ্রনাথকে দেখেন নাই। কংগ্রেসের অধিবেশন সময়ে আমেদাবাদে অরবিন্দের সঙ্গে বারীন্দ্র কুমার সুখপেহ হোটেলে থাকতেন। ঠাকুর সাহেবের গুপ্ত সমিতির পক্ষ থেকে লেফ্‌টেন্ট মাধবরাও যাদবকে সামরিক শিক্ষার জন্য জাপানে পাঠাবার আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ। এর টাকা দিয়েছিলেন আই. সি. এস. মাড্‌গাওকার। হোটেলে অরবিন্দের এখানে বসে এই সব নিয়াই আলোচনা হত। বারীন্দ্র কুমার ছিলেন নিষ্ঠাবান শ্রোতা। এর অল্প কিছুদিন পরেই আমেদাবাদ থেকে বরোদায় ফিরে এসে বারীন্দ্র কুমার কলকাতায় এসে প্রমথনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেন।

বারীন্দ্র কুমার বলেন, "তাজমহল হোটেলে বসে আলোচনায় বাংলার কাজের কথায় প্রসঙ্গ ওঠে নাই, ওঠা স্বাভাবিকও নয়। সেটাই ছিল গুজরাটের কাজ। বিশেষ করে মাধবরাওকে জাপানে পাঠাবার সম্বন্ধেই তার দুইজন অনুরাগীর জটলা অরবিন্দকে কেন্দ্র করে।

"কিন্তু আসলে বাংলার সঙ্গে বিপ্লবীচক্রের সম্পর্ক তখনও পুরাপুরি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। যোগসূত্র শুধু নিবেদিতার সংবাদ এবং অরবিন্দের নির্দেশ দিয়ে যতীন্দ্রনাথ বাংলায় পি. মিত্রের নিকট

আসেন। সুতরাং বাংলায় কি হচ্ছে না হচ্ছে তা বরোদায় জানবার কথা নয়।

মারাঠাদেশের এই গুপ্ত সমিতির নেতা ছিলেন ঠাকুর সাহেব। তিনি তাঁর পূর্বজীবনে ছিলেন রাজপুতানা বা মধ্যপ্রদেশের কোনও এক ক্ষুদ্র করদ রাজ্যের নরপতি। মহারাষ্ট্রের গুপ্ত সমিতির জন্যে ভারতের ভবিষ্যৎ প্রজাতন্ত্রের ইনিই হলেন 'দেশপতি'। বারীন্দ্র কুমার বলেন, "রুশ-জাপান যুদ্ধ বাঁধবার পরে ঠাকুর সাহেব ঐ যুদ্ধে জাপানের পক্ষে যোগ দিবার জন্য জাপান যাত্রা করেন। সেখান থেকে আর তিনি দেশে ফিরেন নাই। শুনা যায়, তিনি সেই যুদ্ধে মারা গিয়েছেন।"

বারীন্দ্রকুমার বলেন, "১৯০২ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯০৪ খ্রীঃ অবধি সমগ্র বাংলায় শক্তিচর্চার এক বিপুল বহুমুখী আন্দোলন রূপ নিয়েছিল, পুনার সেই চাপেকায় প্রতিষ্ঠিত সমিতির অনুকরণে—যার গুপ্ত চক্রের গুর্জর সার্কেলের সভাপতি ছিলেন অরবিন্দ। সুতরাং এই শক্তিচর্চার বীজ অরবিন্দের দ্বারা প্রেরিত হয়ে বাংলায় আসে যতীনদা' তার বাহক।" কিন্তু বারীন্দ্র কুমারের একথা আদৌ সত্য নয়। শক্তিচর্চার বা শরীরচর্চার ভাবধারা পূর্ব থেকে বাংলা দেশে প্রচলন ছিল। ঠাকুরবাড়ীকে কেন্দ্র করে 'জাতীয় মেলা' বা 'ভারত মেলা' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে। ঋষি রাজনারায়ণকে কেন্দ্র করে সঞ্জীবনী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৭৬ খৃঃ অব্দে এ কাহিনী আগেই বলা হয়েছে এই দুইটি সংগঠনে সঙ্গেই শরীরচর্চা ছিল। এই শরীরচর্চাকে কেন্দ্র করে প্রতিষ্ঠিত সতীশ চন্দ্র বসুর প্রখ্যাত অনুশীলন সমিতিই তার সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে ১৯০২ সালে তার সর্বাধিনায়ক প্রমথনাথ মিত্রকে মহান করে বার করেছিল। তখনও বাংলার সঙ্গে মারাঠা সংগঠনের যোগসূত্র স্থাপিত হয় নাই। দ্রুত শরীর চর্চা চলছিল কিনা সে সংবাদ বাংলার যুবকদল রাখল না। তবে একথা ঠিক যতীন্দ্র নাথের আগমনে বাংলায় এই স্রোতে শক্তি সঞ্চারিত হয়ে

একে এক মহাপ্লাবনের আকার দিয়েছিল। শুধু শরীরচর্চাও নয় এই পথ ধরে ক্রমে বাংলা তথা সমগ্র ভারতীয়ের জীবনে আসে অস্ত্রশিক্ষার প্রেরণা, যে প্রেরণা ভারতকে ক্রমে স্বাধীনতার দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

যাদের চেষ্টা ও সাহায্যে অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাঁদের মধ্যে যতীন্দ্রনাথ শেঠের নাম উল্লেখযোগ্য। যতীন্দ্রনাথের সহধর্মিনী শ্রীমতী শেফালি শেঠ তাঁর "সঙ্গীত শাস্ত্র কণিকায়" লিখেছেন :—

"স্বদেশী আন্দোলনের উত্তাল মুহূর্ত্তে অনুশীলন সমিতির প্রধান কার্য্যালয় কলিকাতাস্থ ৪৯নং কর্ণওয়ালীশ ষ্ট্রীটের সন্নিকটে মদন মিত্র লেনস্থ ক্রীড়া প্রাঙ্গণে শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয় সমিতির যুবসঙ্ঘের সহিত কয়েকবার মিলিত হন এবং সামান্য একখানা কাঠের টুলে বসিয়া তাঁহার নবরচিত কয়েকখানি বাউল গান প্রাণের উচ্ছ্বাসে গাহিয়া শোনান। এগুলি সাধারণ্যে প্রচারও এইরূপে হয়। নিম্নলিখিত গানগুলি এইরূপে সমিতির সভ্যদিগকে তাঁহাদের দেশ-প্রেমে উৎসাহিত করিবার জন্যই মুখ্যতঃ রচিত হয় :—

১। ও মা তোমার দেশের মাটি তোমার পায়ে ঠেকাই মাথা।
২। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলরে।
৩। ও তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে তা বলে ভাবনা করা চলবে না।
৪। আপনি অবশ হলি তবে বল দিবি তুই কারে ?
৫। নিশিদিন ভরসা রাখিস ওরে মন হবেই হবে।
৬। আমি ভয় করবোনা ভয় করবোনা।
৭। এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে।
৮। নাই নাই ভয়, হবে হবে জয়, খুলে যাবে এই দ্বার।
৯। ওদের বাঁধন যত শক্ত হবে।
১০। আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে।
১১। আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।

জোড়াসাঁকো শিবকৃষ্ণ দাঁ লেনে অনুশীলন সমিতির একটি শাখা ছিল। রবীন্দ্রনাথের পুত্র রথীন্দ্র নাথ এই শাখার সভ্য ছিলেন। তখন তাঁর বয়স ১৪/১৫ বৎসর হবে। জাতীয় শিক্ষা সম্পর্কে জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে রথীন্দ্রনাথ, নগেন গাঙ্গুলী, সন্তোষ মজুমদার প্রভৃতি যখন আমেরিকা যাত্রা করেন, ৪৯নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে সমিতির পক্ষ থেকে এক প্রীতি সম্মেলনের আয়োজন হয়। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এবং সভ্যদের সঙ্গে আহারাদি করেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পূর্বে বলা হয়েছে যে, বাঙ্গালীকে সামরিক জাতি হিসাবে দেখবার আকাঙ্ক্ষা প্রমথনাথের মধ্যে প্রবল ছিল। বাঙ্গালীর অস্ত্রধারণের অধিকার নেই এ ক্ষোভ প্রমথনাথের ন্যায় অনেক শিক্ষিত বাঙ্গালীরই সে যুগে ছিল। এই মনোভাব নিয়েই ব্রহ্ম-বান্ধব উপাধ্যায় সেনা বিভাগে প্রবেশ করতে চেষ্টা করেছিলেন। এই একই মনোভাব জেগেছিল বর্দ্ধমান জেলায় খানা জংশনের নিকটে খড়ে নদীর তীরবর্ত্তী চান্নাগ্রামের তরুণ যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনে। যতীন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ নভেম্বর। তাঁর পিতার নাম কালীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি যশোহরের ম্যাজিষ্ট্রেটের অফিসে পেস্কার ছিলেন। গ্রামের পড়া শেষ ক'রে যতীন্দ্রনাথ বর্দ্ধমান রাজস্কুলে ভর্ত্তি হন এবং সেখান থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করেন। এই সময় তাঁহার মনে সৈন্যদলে প্রবেশের বাসনা জাগে। পরাধীনতার তীব্র জ্বালা হৃদয়ে যুবকমাত্রই অনুভব করতেন। বিশ্ববিপ্লবী স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতা বাঙ্গালীর মনে আত্মবিশ্বাস এনে দিয়েছিল। তাতেই প্রেরণা পেয়ে বাঙ্গালী বিশ্বজয়ে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু এ পথে বাঙ্গালীর সব চেয়ে বড় বাধা পরাধীনতা। আর সে অস্ত্রহীন, ইংরেজ তাকে নিরস্ত্র করে রেখেছে। তাই সশস্ত্র সংগ্রামে ইংরেজকে পরাজিত করে মাতৃভূমিকে উদ্ধার করতে সে অক্ষম। এ ক্ষোভ সে যুগে অন্যান্য শিক্ষিত বাঙ্গালীর ন্যায়

যতীন্দ্রনাথের মধ্যেও ছিল। তিনি স্থির করলেন, যে কোন উপায়ে অস্ত্রশিক্ষার ব্যবস্থা করতেই হবে। পরিকল্পনা স্থির করতে বিলম্ব হল না। তখন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এলাহাবাদে প্রবাসী। তিনি কায়স্থ পাঠশালা কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ। যতীন্দ্রনাথ প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ ক'রেই সিদ্ধান্ত করলেন, এলাহাবাদে গিয়ে কায়স্থ পাঠশালা কলেজে ভর্ত্তি হবেন এবং দেহাতী হিন্দী ভাষা শিখে হিন্দী নামে সৈন্যদলে ভর্ত্তি হবেন। যে কথা সেই কাজ। যতীন্দ্রনাথ এলাহাবাদে গিয়ে রামানন্দ বাবুর সঙ্গে এবং ক্রমে তাঁর পরিবারের সঙ্গেও পরিচিত হলেন। রামানন্দবাবু যতীন্দ্রনাথকে তাঁর পুত্রদের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করলেন। রামানন্দ বাবুর পরিবারেই যতীন্দ্রনাথ বাস করতে লাগলেন। রামানন্দ বাবুর পত্নীকে তিনি মাতৃসম্বোধন করতেন। রামানন্দ বাবুর পুত্রদের তিনি ছিলেন যতীনদা।

অধ্যয়ন যতীন্দ্রনাথের প্রকৃত লক্ষ্য ছিল না। তিনি দেহাতী হিন্দী ভাষা শিখবার জন্য এলাহাবাদের নিকটবর্ত্তী পল্লী অঞ্চলে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। এলাহাবাদের নিকটবর্ত্তী এক গ্রামের নাম আড়ারিয়া। এই গ্রামে উপাধ্যায় পরিবারের বাস। যতীন্দ্রনাথ এই পরিবারভুক্ত বলে যতীন্দর উপাধ্যায় নামে বরোদা সৈন্যদলে ভর্ত্তি হলেন। ১৯৩০ সালের ৫ সেপ্টেম্বর যতীন্দ্রনাথের পরলোক গমনের পর মর্ডার্ন রিভিউ পত্রিকায় তাঁর সম্বন্ধে লেখা হয়েছে: এলাহাবাদ কায়স্থ পাঠশালা কলেজে তিনি কয়েক বৎসর অধ্যয়ন করেন। তখন বাবু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ঐ কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। এক সময় তিনি বরোদা সৈন্যদলে ছিলেন। সেই সময় অরবিন্দ ঘোষ ঐ রাজ্যের শিক্ষা বিভাগে কাজ করতেন।

সৈন্য বিভাগে যতীন্দ্রনাথ বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে ক্রমে মহারাজ সয়াজীরাও-এর দেহরক্ষী নিযুক্ত হলেন। কিন্তু এই সময় উপাধ্যায় পরিচয় নিয়ে এক ব্যক্তি বরোদার সৈন্যদলে প্রবেশ

করতে এসে যতীন্দ্রনাথের বাঙ্গালী পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়ে। কিন্তু সৈন্যদলে খাসিরাও যাদব এবং মাডগাওকার প্রভৃতি অধিনায়কগণ অরবিন্দের বন্ধু। অরবিন্দের চেষ্টায় যতীন্দ্রনাথ প্রবঞ্চনার দায় থেকে মুক্তি পান। কিন্তু তিনি সৈন্য বিভাগের চাকুরীতে ইস্তফা দিতে বাধ্য হন। চাকুরী ছেড়ে যতীন্দ্রনাথ অরবিন্দের সঙ্গেই একসঙ্গে বাস করতে থাকেন।

এই সময় ১৯০২ সালের ২০ অক্টোবর ভগিনী নিবেদিতা বরোদা মহারাজের আমন্ত্রণে বরোদা যান। সেখানে অরবিন্দের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় এবং উভয়ে উভয়ের বিপ্লবী মনোভাব বুঝতে পারেন। এর আগেই অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠা হয়েছে এবং ভারতব্যাপী সশস্ত্রবিদ্রোহের উদ্যোগ-আয়োজন তখন চলেছে। নিবেদিতা অরবিন্দকে একসঙ্গে কাজ করতে বলেন এবং মহারাজ সয়াজীরাও-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকালে তাঁকেও এই উদ্দেশ্যে আয়োজনে সাহায্য করতে বলেন। অরবিন্দ নিবেদিতার আহ্বানে সাড়া দিলেন এবং নিজে না এসে সরলাদেবীর নামে পত্র দিয়ে যতীন্দ্রনাথকে বাংলায় পাঠিয়ে দিলেন।

সরলাদেবী এই সময়ে অনুশীলন সমিতির সদস্য ছিলেন। সরলাদেবী যতীন্দ্রনাথকে প্রমথনাথের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। এই সম্পর্কে সমিতির সম্পাদক সতীশ চন্দ্র বসু বলেন, "একদিন মিত্তির সাহেব আমাকে ডাকিয়া বললেন—বরোদা থেকে একটি দল আসিয়াছে। তোমাদের উদ্দেশ্য অনুযায়ী-উদ্দেশ্য তাহাদেরও। সর্বপ্রকার সামরিক শিক্ষা তাহারা দিবে। তাহাদের সঙ্গে তোমাদের amalgamation করিতে হইবে। আমরাও রাজী হইলাম। এই ভাবে উভয় দলে মিল হইয়া গেল। তাহার ফলে যে সমিতি গঠিত হইল তাহার সভাপতি হইলেন প্রমথনাথ মিত্র, সহ-সভাপতি হলেন চিত্তরঞ্জন দাস ও অরবিন্দ ঘোষ।"

যতীন্দ্রনাথ কলকাতায় এসে অনুশীলন সমিতিভুক্ত হয়েই কাজ করতে থাকলেন এবং প্রায় ছয় মাস পরে শ্রীঅরবিন্দ

ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমারকেও দীক্ষা দিয়ে কলকাতা পাঠিয়ে দিলেন। বারীন্দ্রকুমারও এসে যতীন্দ্রনাথের অধীনে অনুশীলন সমিতিতেই কাজ করতে লাগলেন।

প্রমথনাথ অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সশস্ত্র বিপ্লব সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই। এই উদ্দেশ্য নিয়েই সংগঠন চলছিল। কিন্তু এ কাজ যে যথেষ্ট দ্রুততার সহিত অগ্রসর হচ্ছিল তা বলা চলে না। প্রকৃতপক্ষে বিপ্লবী সমিতি হিসাবে অনুশীলন সমিতির কার্য্য যতীন্দ্রনাথ ও বারীন্দ্রকুমার এসে যোগ দিবার পরেই আরম্ভ হয়। প্রধানতঃ যতীন্দ্রনাথের উদ্যোগেই ১০৮ নং আপার সার্কুলার রোডে অনুশীলন সমিতির কেন্দ্র খোলা হয়। এই সময় সম্পর্কে বারীন্দ্রকুমার বলেন, শ্রীঅরবিন্দ তখন গায়কোয়াড় তরুণ সয়াজীরাও-এর অমাত্য, তিনি পুনায় গুপ্ত বিপ্লবীনেতা ঠাকুর সাহেবের গুপ্ত সমিতিতে দীক্ষিত এবং গণতন্ত্রী ভারতের গুজরাট শাখার সভাপতি। বরোদার মহারাজার শরীর রক্ষার কার্য্যে ইস্তফা দিয়ে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গুপ্ত সমিতি গঠন উদ্দেশ্যে সরলাদেবীর নামে অরবিন্দের পত্র নিয়ে বাংলায় আসেন। যতীনদা বারিষ্টার পি. মিত্রকে কেন্দ্র ক'রে সুকীয়াষ্ট্রীট থানার নিকট ১০৮ নং সার্কুলার রোডের বাড়ীতে গুপ্ত সমিতির প্রথম কেন্দ্রের গোড়া পত্তন করলেন। অরবিন্দের কাছে দীক্ষা নিয়ে আমি এই কেন্দ্রে আসি ১৯০৩ সালের গোড়ার দিকে যতীনদা বাংলায় আসার পরে। বিপ্লব আন্দোলনের স্রষ্টা প্রমথনাথ কিন্তু এতে প্রাণ সঞ্চার করেছেন যতীন্দ্রনাথ।

যতীন্দ্রনাথ বাংলায় আসার ছয় মাস পরে অর্থাৎ ১৯০৩ সালের জুন-জুলাই মাসে অরবিন্দ বারীন্দ্রকুমারকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেন। বারীন্দ্রকুমারের দীক্ষা গ্রহণ অনুষ্ঠানও যতীন্দ্রনাথের বরোদা ত্যাগের পরে অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্পর্কে বারীন্দ্র কুমার লিখেছেন, "অরবিন্দ নিজে আমার হাতে কোষমুক্ত অসি ও গীতা দিয়ে একটি কাগজে সংস্কৃত ভাষায় লেখা দীক্ষাপত্র পাঠ করিয়ে শপথ করান।

তার মর্ম হচ্ছে—"দেহে যতদিন জীবন আছে ও যতদিন বিদেশীর দেওয়া পরাধীনতাশৃঙ্খল থেকে ভারতের মুক্তি না ঘটছে, ততদিন আমি এই বিপ্লবব্রত পালন করে যাব। যদি কখনও এই গুপ্ত সমিতির কোন কথা বা ঘটনা প্রকাশ করি বা সমিতির অনিষ্ট করি, তাহলে চক্রের গুপ্তঘাতকের হস্তে আমার প্রাণ যাবে।" বরোদায় শ্রীঅরবিন্দ ছাড়া আরও বহুলোক এই গুপ্ত সমিতিতে অরবিন্দের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করতেন। তার মধ্যে সিভিলিয়ান মাডগাওকার একজন। কেশব রাও, গণেশ রাও, দেশ পাণ্ডেও অরবিন্দের অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সহকর্মী ছিলেন। লেফটেনাণ্ট মাধবরাও যাদবকে ঠাকুর সাহেবের গুপ্তসমিতি জাপান পাঠিয়েছিলেন সামরিক শিক্ষার জন্য।

এই সময় সম্পর্কে বারীন্দ্র কুমার লিখেছেন, "১৯০৩ সালে আমাদের ধারণা ছিল যে, আমাদের বিপ্লবী চেষ্টায় ১৯০৬ সালের মধ্যেই ভারত স্বাধীন হবে। তখন আমরা জানতাম আমরা ঠাকুরসাহেবের ভারতব্যাপী বিশাল গুপ্তসমিতির একটি শাখামাত্র। পর্বতে অরণ্যে সহস্র সহস্র নাগা সাধু-সন্ন্যাসী ও দেশী রাজন্যবর্গ কিরিচ তলোয়ার শানাচ্ছে। ইঙ্গিত পেলেই তারা দক্ষযজ্ঞের পালা সুরু করবে।"

অনুরূপ কথা ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তও বলেছেন। এই সর্ব-ভারতীয় বিপ্লবপ্রচেষ্টা অরবিন্দের উদ্দেশ্য ছিল। এই জন্যই বাংলার বিপ্লবীদল যাতে সর্বভারতীয় বিপ্লবীদলের সঙ্গে সংযোগ রেখে চলতে পারে এই উদ্দেশ্যে নিবেদিতার অনুরোধে নিজে এখানে না এসেও যতীন্দ্রনাথ এবং বারীন্দ্র কুমারকে পাঠিয়েছিলেন। নিজে বাংলার বাইরে থেকে সর্বভারতীয় সংগঠনের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করবেন সম্ভবতঃ এই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু পরে তিনি বুঝতে পারেন বাংলার বাইরে সংগঠন কত খেলো। এই জন্যই ১৯০৬ সালে বরোদা ছেড়ে বাংলাদেশে এসে গুপ্ত এবং প্রকাশ্য উভয় আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

যতীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বারীন্দ্র কুমার লিখেছেন—

"মায়ের বোধনের অরবিন্দপ্রেরিত প্রথম যন্ত্রী ছিলেন যতীনদা, ১০৮ নং সার্কুলার রোডের প্রথম গুপ্তচক্রের সর্বময় কর্তা, দীর্ঘকায় শালপ্রাংশু মহাপুরুষ। যতীনদার মুখে সদাপ্রসন্ন হাসিটুকু থাকতো লেগে, অথচ তার দুইটি উজ্জ্বল প্রসন্ন চোখে ছিল তীব্রদীপ্তি, অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, কথায় ছিল ক্ষুরের ধার। কথায় যুক্তিতে এবং তর্কে তার সঙ্গে সহজে কেউ এঁটে উঠতে পারতো না।"

বাংলার এই বিপ্লব কেন্দ্রটি ছিল সুকীয়া ষ্ট্রীট থানার গা ঘেসে। একটা সাইকেল কেনা হয়েছিল। বাড়ীর সামনে মাঠে ছিল ব্যায়ামশালা। থানার পুষ্করিণীতে তাদের সম্মতি নিয়ে সাঁতার শিখত কর্মীদল। রাস্তায় তখন বাস বা ট্রাম ছিল না। তাই কর্মীরা ওয়েলার ঘোড়ায় চেপে অশ্বারোহণ শিখতেন। সতীশ বসু ছিলেন পাকা ঘোড়সওয়ার। মাঠে কুস্তী, বক্সিং এবং সাইকেল চলত। যতীন্দ্রনাথ প্রতিদিন সকালে তার জমকালো সামরিক পোষাক পরে ওয়েলার অশ্বে চেপে গড়ের মাঠের পথে যেতেন বালিগঞ্জের বিশিষ্ট মহলে চাঁদাআদায়ে। জন্মগত ক্ষত্রিয় গুণসম্পন্ন এই বীরকে দেখে মনে হত যেন আগুন নিয়ে খেলা করবার জন্যই তার জন্ম হয়েছে। পরবর্তী জীবনে তিনি যখন সন্ন্যাসী নিরালম্বস্বামী, তখনও তিনি ছিলেন হাজার হাজার সাঁওতালদের নেতা।

অনুশীলন সমিতির লাইব্রেরীতে ভগিনী নিবেদিতা যে সমস্ত পুস্তক দান করেছিলেন তার মধ্যে ছিল—আইরিশ বিদ্রোহের ইতিহাস, ডাচ প্রজাতন্ত্রের ইতিহাস, গ্যারিবল্ডি ও ম্যাটসিনির জীবনচরিত, সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস, আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, টডের রাজস্থান, টম কাকার কুটির, রামায়ণ, মহাভারত, দাদাভাই নৌরজী, রমেশ দত্ত এবং উইলিয়াম

ডিগবীর অর্থনীতির বই। এ ছাড়া ছিল ভারতবর্ষের ইতিহাস, ক্রমওয়েলের জীবনী, ব্লক এর War made Impossible এবং ব্যারন ওকাকুরার Ideals of the East ও অন্যান্য বই। ব্যাপক ধ্বংস ও বৈজ্ঞানিক মারণাস্ত্র তৈরীর একখানা বইও ছিল।

ভগিনী নিবেদিতা যখন তাঁর বইগুলি অনুশীলন সমিতিকে দেন, তাঁর নির্দেশ ছিল যে, এই সকল পুস্তক অবলম্বনে সমিতিতে রাজনীতি শেখার এক কর্মীদল গড়বার জন্য স্কুল বা Study circle গড়ে তোলা হবে। Study circle নিয়মিত ভাবেই চলত। দেশ বিদেশের ইতিহাস, মনীষিদের জীবন চরিত, অর্থনীতি, ধর্মনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি আলোচনা হত Study circle-এ। নিবেদিতা বলেছিলেন, এখানকার ছাত্ররা প্রচারক হয়ে ভারতের নবজাগরণে চারণরূপে নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে গিয়ে বিপ্লবের বাণী প্রচার করবে এবং বিপ্লবের বীজ বপন করবে। এই ভাবে সমগ্র দেশে গড়ে উঠবে অসংখ্য বিপ্লব কেন্দ্র।

বারীন্দ্র কুমার জানিয়েছেন, তাঁর বাংলাদেশে আসার আগেই নিবেদিতা বই গুলি দিয়ে ফেলেছেন। বারীন্দ্র কুমারই এই রাজনীতি স্কুল বা Study circle-এর প্রথম ছাত্র। এর পরে ক্রমে এসে জুটলো দেবব্রত বসু, নলিন মিত্র, জ্যোতিষ সমাজ-পতি, অবিনাশ ভট্টাচার্য্য, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি। আত্মোন্নতি সমিতি থেকে ইন্দ্রনাথ নন্দী এবং আরও দুই একজন এসে যোগ দিতেন।

বারীন্দ্র কুমার আসার পরে তিনি সখারাম গণেশ দেউস্করকে ডেকে এনে প্রেসিডেন্ট মিত্তির সাহেবের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। গণেশ দেউস্কর ছিলেন ছত্রপতি শিবাজীর পরম ভক্ত মারাঠি ব্রাহ্মণ। দেওঘর স্কুলে তিনি বারীন্দ্র কুমারের শিক্ষক ছিলেন। বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস কালে বারীন্দ্র কুমার তাঁর নিকট লাঠি খেলা শিখতেন। ছাত্রদল দেওঘর নন্দন পাহাড়ে মোগল ও মাওলী

দুই দলে বিভক্ত হয়ে যুদ্ধের অভিনয় করত। হিতবাদিতে শাসকের বিরুদ্ধে লিখবার অপরাধে সখারাম বাবুর চাকুরী যায়। এরপরে তিনি হিতবাদিতে চাকুরী পান। প্রমথনাথ তাঁকে অর্থনীতির ক্লাশ নিতে বলেন। এর আগে অর্থনীতির ক্লাশ নিতেন স্থরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। কিন্তু তিনি সময় করে উঠতে না পারায় সখারাম বাবুই এই ক্লাশ নেন। ব্রিটিশ ভারতে ইংরেজদের অর্থনৈতিক শোষণের ইতিহাস আলোচনা করতেন তিনি। লেকচারগুলিই পরে "দেশের কথা" নামে প্রকাশিত হয়। প্রমথনাথ পড়াতেন সিপাহী যুদ্ধ, শিখ অভ্যুত্থান এবং ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস। তিনি সার্কুলার রোডের কেন্দ্রে বড় একটা আসতেন না। এখানকার ভার যতীন্দ্রনাথের উপরই ছিল। তরুণদল লোয়ার সার্কুলার রোডে তার গৃহে গিয়ে ইতিহাসের ক্লাসে যোগ দিত এবং আলোচনান্তে গৃহের সম্মুখের মাঠে বড় লাঠি এবং ছোট লাঠি শিখে সন্ধ্যার পরে কেন্দ্রে অথবা নিজ নিজ গৃহে ফিরত। লাঠিখেলা শেখাতেন প্রমথনাথ স্বয়ং। ছেলে গদ্‌কাও অনেক সময় লাঠিখেলা শেখাত। যতীন্দ্রনাথ নিতেন রাজনীতির ক্লাশ। ক্লাশের ছাত্রদের নিকট তিনি উচ্ছ্বাসভরা অগ্নিদীপ্ত ভাষায় ভাবী বিপ্লবের কথা বলতেন। স্থরেন্দ্রনাথ ঠাকুর পড়াতেন ইতালীর নব জাগরণের কাহিনী, আমেরিকার স্বাধীনতার ইতিহাস, আইরিশ মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাস এবং ওলন্দাজ প্রজাতন্ত্রের ইতিহাস প্রভৃতি।

বিপ্লবী কর্মীরা এখানে শিক্ষা পেয়ে নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়লেন। মফঃস্বল অঞ্চলে প্রথম বিপ্লবকেন্দ্র গড়ে উঠল মেদিনীপুরে। এখানকার কর্মীদের মধ্যে ছিলেন যোগেন্দ্রনাথ বসু, জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, নিরাপদ রায়, হেমচন্দ্র কানুনগো, ক্ষুদিরাম বসু প্রভৃতি। কেন্দ্র ভবনের নাম ছিল— 'আনন্দ মঠ'—একটি শ্রীহীন ছোট্ট বাড়ী। ঘর-ছাড়া কর্মীদল মাদুরেই শয়ন করত। গৃহ মধ্যে ছিল লোল-জিহ্বা রক্ত-নেত্র,

খড়্গহস্তে কালী প্রতিমা। জ্ঞানেন্দ্র নাথ মূলকেন্দ্রের সঙ্গে মেদিনীপুর কেন্দ্রের সংযোগ রক্ষা করতেন।

কলকাতার বিভিন্ন পার্কে কর্মীরা এসে মিলিত হতেন। তাদের আকর্ষণে নূতন ছেলেরা এসে ধরা দিত। হেদুয়া, কলেজ স্কোয়ার প্রভৃতি ছিল ছেলেধরার কেন্দ্র। খড়দহে এবং চন্দননগরে গঙ্গার ঘাটেও কর্মীদল হানা দিতেন। একবার খড়দহে এরূপ এক অভিযানে বারীন্দ্রকুমারের সঙ্গী ছিলেন সখারাম বাবু। বিশিষ্ট কর্মীদের বিপ্লবকেন্দ্র স্থাপনের উদ্দেশ্যে বাংলার বাইরে কটক, পুরী প্রভৃতি স্থানেও পাঠান হত।

১০৮ নং সার্কুলার রোডের বিপ্লবকেন্দ্রে চলত প্রধানতঃ তখনও যতীন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে। তখনও মদন মিত্র লেনের লাঠিখেলা ও ব্যায়ামকেন্দ্রও তুলে দেওয়া হয়নি। এখানে অপেক্ষাকৃত অল্প বয়স্ক বালকদল ব্যায়াম করত। যতীন্দ্রনাথের কর্তৃত্ব ও পরিচালনার গুণে সার্কুলার রোডের বিপ্লবকেন্দ্রের কাজ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হতে লাগল। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল পেরিয়ে বিপ্লবের বাণী প্রসারিত হল বিহার, উড়িষ্যা, আসাম প্রভৃতি প্রদেশে। এই সময়ে বিপ্লবকেন্দ্রে আরম্ভ হল ভাঙন।

বিপ্লবী হিসেবে বারীন্দ্রকুমারের অনেক গুণ ছিল কিন্তু কারও নেতৃত্ব মেনে চলার মত লোক বারীন্দ্রকুমার ছিলেন না। যতীন্দ্রনাথ অত্যন্ত কঠোরভাবে বিপ্লবকেন্দ্রের নিয়ম শৃঙ্খলা রক্ষা করতেন। কেন্দ্রের যুবকদল এতটা কড়াকড়ি চাইত না। বারীন্দ্রকুমার এ সম্পর্কে বলেছেন, "যতীনদার জবরদস্তী সর্দারীর বিরুদ্ধে কর্মীদলে ধূমায়িত হয়ে উঠছিল বিদ্রোহ।" প্রকৃতপক্ষে যতীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ বারীন্দ্রকুমারেরই ছিল বেশী। তিনি চাইতেন আত্ম-কর্তৃত্ব।

বিপ্লবকেন্দ্রে যতীন্দ্রনাথ সপরিবারে বাস করতেন। পরিবারে ছিলেন পত্নী হিরণ্ময়ী দেবী এবং এক বিধবা ভগিনী। যতীন্দ্রনাথ যখন গৃহত্যাগী হয়ে এলাহাবাদ এবং বরোদায় ছিলেন ঐ সময়ে

ভগিনী কুসঙ্গে মিশে খারাপ পথে চলে যায়। যতীন্দ্রনাথ দেশে ফিরে তাঁকে গৃহে ফিরিয়ে আনেন এবং তার চরিত্র সংশোধনের চেষ্টা করতে থাকেন। বারীন্দ্র কুমারের নেতৃত্বে সমিতির যুবকদল যতীন্দ্রনাথের এই ভগিনী সম্পর্কেই প্রেসিডেন্ট প্রমথনাথের নিকট অভিযোগ করেন।

এ সম্পর্কে বারীন্দ্র কুমার লিখেছেন—

"ব্যারিষ্টার পি. মিত্র সাহেব ছিলেন বাংলার বিপ্লবীকেন্দ্রের প্রেসিডেন্ট। তাঁর একতলা সাহেবী বাংলো' ফ্যাসানের বাড়ীটি ছিল ১০৮নং লোয়ার সার্কুলার রোডে গোরস্থান পার হয়ে। আমরা তাকে বলতাম বাঘামিত্তির। লাঠিখেলায়, বিশেষ ক'রে বড় লাঠি খেলাতে ও গদা চালনায় বাঘা মিত্তির ছিলেন তেতুলে বাগদীর মত দুর্জয়। 'বেঙ্গলীতে' তিনি রুদ্ররসসিক্ত জলদ গম্ভীর ষ্টাইলে "Om to the beautiful; Om to the terrible" শীর্ষক উত্তেজকপূর্ণ বিপ্লবী লেখা লিখতেন। তাঁর বাড়ীতে বসত আমাদের ইতিহাসের ক্লাস ও লাঠিখেলার আড্ডা। বাড়ীর ভিতর দিকে lawnএ তিনি ও তার তেরো বছরের ছেলে আমাদের শেখাতেন ছোট্ট লাঠি, গদাচালনা ও বড় লাঠি।

যতীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে চক্রান্ত পেকে উঠল। এ দলে যোগ দিলেন দেবব্রত বসু, নলিন মিত্র, জ্যোতিষ সমাজপতি এবং জ্ঞান বসু। নেতৃত্বভার গ্রহণ করলেন বারীন্দ্রকুমার। এ বিষয়ে তিনি লিখেছেন—

"সিদ্ধান্ত করা হল, সমস্ত ব্যাপারটি অবিলম্বে পি. মিত্র মশায়ের গোচর করা দরকার, যেহেতু বাংলার গুপ্ত সমিতির সর্বেসর্বা প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন তিনিই। সকলের দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে আমি ও আরও দু'একজন গিয়ে সভাপতিকে সব সবিস্তারে নিবেদন করলাম। পি. মিত্র ছিলেন বাঘা মিত্তির, নামে ও কাজে দুই-ই— একেবারে একরোখা মারমুখী মানুষ। তিনি সরাসরি হুকুম দিলেন, যতীনদাকে জানানো হোক, হয় তিনি অবিলম্বে মেয়েটিকে ত্যাগ

করুন, আর না হয়তো নিজেই বিপ্লব কেন্দ্রের সঙ্গে সকল সম্পর্ক চুকিয়ে অন্যত্র চলে যান।"

প্রেসিডেণ্টের হুকুমনামা যতীন্দ্রনাথকে শুনাবার ভার নিলেন বারীন্দ্রকুমার স্বয়ং। যতীন্দ্রনাথ সুস্পষ্টভাবে বারীনকে বলে দিলেন, "বোনকে ছাড়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না। তার চেয়ে তিনি বিপ্লব কেন্দ্র ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র চ'লে যাবেন।" কিন্তু যতীন্দ্রনাথ যত দিন চলে না যান তরুণদল ততদিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে সম্মত নয়। তারা ১০৮নং সার্কুলার রোড কেন্দ্র ত্যাগ করে মদন মিত্র লেনে আবার ফিরে গেল। এরপর যতীন্দ্রনাথ উঠে যান সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট। ফলে বিপ্লব কেন্দ্র উঠে গেল।

যতীন্দ্রনাথ বরোদায় শ্রীঅরবিন্দের নিকট সব কথা লিখে জানালেন। চিঠি পেয়েই কাল বিলম্ব না ক'রে তিনি চলে এলেন কলকাতায়। তিনি সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটে যতীন্দ্রনাথের কাছে এসে উঠলেন। বারীনও অন্যান্য তরুণ কর্মীদের ডেকে পাঠালেন সেখানে। মেয়েটিকে ডেকে তার শরীরের গঠন এবং যতীন্দ্রনাথের শরীরের গঠন ভাল করে দেখালেন বারীন প্রভৃতিকে। বললেন— মেয়েটি প্রকৃতই যতীন্দ্রনাথের বোন। এতে সন্দেহ করবার কিছুই নেই।

অরবিন্দের কথায় বিরোধ আপাতভাবে মিটে গেল। তরুণদলের আলাদা কেন্দ্র তুলে দেওয়া হল। স্থির হল, আবার সবাই মিলে মিশে কাজ করবে। কিন্তু অরবিন্দ ঠিকই সন্দেহ করেছিলেন— সব গোলমালের মূলে বারীন্দ্রকুমার। তাই বারীন্দ্রকুমারকে কিছুদিনের জন্য সরিয়ে বরোদা নিয়ে গেলেন কিন্তু এসত্ত্বেও এ মিলন টিকলনা। যতীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে অভিযোগ হল, তার পরিচালনা ব্যয়বহুল। বিচারের ভার দেওয়া হল যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের উপর। তিনি বিচার করে যতীন্দ্রনাথকে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দিলেন। কিন্তু যতীন্দ্রনাথের মন তখন ভেঙে গিয়েছে। তিনি বিপ্লবীদল ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাস জীবন অবলম্বন

করলেন। সোহং স্বামীর নিকট দীক্ষান্তে তার নাম হল নিরালম্ব স্বামী। বিপ্লবকেন্দ্রে এই ভাঙন দেখা দিয়েছিল ১৯০৪ সালে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বারীন্দ্রকুমার আবার বরোদায় গিয়ে দেখেন সেখানে অরবিন্দ-গৃহে প্লানচেটের আসর জমে উঠেছে। অরবিন্দের গৃহে তখন ছিলেন বারীন্দ্রের দিদি সরোজিনী, বৌদিদি অরবিন্দপত্নী এবং সেজোমাসী। তারা অবসর বিনোদন করতেন প্লানচেট নিয়ে। এই প্লানচেটের খেলায় অরবিন্দও যোগ দিতেন। বারীন্দ্র মাঝে মাঝে যোগ দিতেন। মৃতা পিসিমা, মাসীমা, ঠাকুরমা প্রভৃতির সঙ্গে রামকৃষ্ণ, ফাদার দামিয়ন, কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতিকেও ডাকা হত। বারীন্দ্রকুমার বলেন,—

"এইরূপ প্লানচেট মাধ্যমে ভূতলোক হাত্‌ড়াতে হাত্‌ড়াতে এই কাষ্ঠ কলকে এসে একদা ভর করলেন রামমোহন ও বিবেকানন্দ ঠাকুর। তারা দুজনে বিশেষ করে প্রথমোক্ত আদি বঙ্গগুরু রামমোহন আমাদের ক্রমান্বয়ে প্ররোচনা দিতে লাগলেন বঙ্গদেশে গিয়ে এবার ধর্মের ভিত্তিতে দেশমাতার মুক্তি যজ্ঞবেদী রচনা করবার জন্য। বাণী সহযোগে আসতে লাগলো দিনের-পর-দিন প্রচুর উদ্দীপনা, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বিপ্লবী নেশায় নেশাখোর প্রাণ হয়ে উঠতে লাগলো চুর মাতাল। শেষে একদিন অরবিন্দের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে আমি আবার করলাম স্বদেশের দিকে তল্পি তল্পা বেঁধে যাত্রা। লর্ড কার্জনের আমল তখন, বঙ্গদেশে বঙ্গভঙ্গ নিয়ে তোলপাড় চলছে। পরবর্ত্তী কংগ্রেসে প্রচারের উদ্দেশ্যে গোপনে ছাপাবার জন্য একটি অগ্নিদীপ্ত ভাষায় লেখা পুস্তিকার পাণ্ডুলিপি অরবিন্দ আমার হাতে দিলেন, তার শিরোনামা ছিল "No compromise-আপোষ চাই না।" আমাদের মধ্যে স্থির হলো, দুর্গম কোন পার্বত্য স্থানে গভীর অরণ্যে ভবানীমন্দির গড়ে সেখানে

শিবাজীর খড়্গহস্ত। ভবানী মায়ের চরণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ নিবেদিত-প্রাণ কর্মী ও মহাযোদ্ধা সব গড়তে হবে। অরবিন্দের স্বহস্তলিখিত ভবানী মন্দির পুস্তিকার পাণ্ডুলিপিও তিনি আমার হাতে দিলেন, গোপনে ছেপে অনুকূলক্ষেত্র বেছে খাঁটি মানুষদের দেবার জন্য।

বারীন্দ্রকুমার যখন দ্বিতীয়বার বরোদায়, যতীন্দ্রনাথ তখন সোহহং স্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করে সন্ন্যাসী জীবন অবলম্বন করেছেন। এই সময়ে অনুশীলন সমিতিতে উল্লেখযোগ্য কোন কাজ হয়নি। কেন্দ্রীয় কোন বিপ্লব কেন্দ্রও ছিল না। কিন্তু কলকাতা ও মফঃস্বলের বিভিন্ন শাখা কেন্দ্র তাদের ব্যায়াম ও লাঠি খেলা বজায় রেখে চলছিল সতীশচন্দ্র বসুর পরিচালনাধীনে। সতীশচন্দ্র প্রয়োজন মত প্রমথনাথের নিকট থেকে পরামর্শ নিতেন। বিশিষ্ট বিপ্লবী নেতা ডঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় এই সময়ে অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেন। তিনি বারীন্দ্রের দলে যোগ দেননি। বারীন্দ্রকুমার দ্বিতীয়বার বাংলাদেশে এলে বৈপ্লবিক হত্যাকাণ্ড আরম্ভ করার পক্ষেও তিনি তাঁর মতের বিরোধী ছিলেন। সমিতিটি যে সক্রিয় ছিল তার আরও একটি প্রমাণ এর কিছুদিন পরে প্রমথনাথও বিপিনচন্দ্রের উদ্যোগে ঢাকা অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠা।

বারীন্দ্রকুমার দ্বিতীয়বার বাংলাদেশে আসেন ১৯০৫ সালের প্রথম ভাগে। ১৯০৪ সালের পূজার সময়ে তিনি অরবিন্দের সঙ্গে বাংলা ত্যাগ করেন। প্রায় দেড় বৎসর তিনি সমিতিতে অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি যখন বাংলায় ফিরে এলেন, এ প্রদেশের আকাশে তখন অনুকূল বাতাস বইছে। ১৯০৩ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রথম বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব হল। এর এক বৎসর আট মাস পরে সিমলার গদী থেকে লর্ড কার্জন ১৯০৫ সালের ২০শে জুলাই ঘোষণা করলেন যে, বঙ্গভঙ্গ অনিবার্য্য। এই সময় থেকে ১৯০৮ সালের এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত প্রায় তিন বৎসর কালকে বাংলার আন্দোলনের প্রজ্বলিত যুগ বলা যেতে পারে। বৈপ্লবিক আন্দোলনেও সর্বাপেক্ষা দ্রুত প্রসার

এই সময়েই হয়। ১৯০৮ সালের এপ্রিল মাসে মজফরপুর বোমার ঘটনার ফলে পরবর্ত্তী বিস্ফোরণ যুগের আবির্ভাব হয়।

বঙ্গভঙ্গের ফলে সমগ্র বাঙ্গালী জাতি উত্তেজনায় যেন ফেটে পড়ল। সেদিনের এই উত্তেজনা কেবলমাত্র শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না। চারণের কণ্ঠভেরী পল্লীচাষী এবং শ্রমজীবীর প্রাণেও আগুন ছুঁইয়ে দিয়েছিল। বিদেশী বর্জন এবং বঙ্গভঙ্গ রোধ ছিল সেদিন বাঙ্গালীর 'পণ। তরুণ সমাজ এমনভাবে স্বদেশীর অনুরাগী হল যে, চায়ের পেয়ালা অন্তর্হিত হয়ে তাদের হাতে উঠল নারকেলের মালা। বাংলার আনাচে কানাচে স্বদেশী পণ্য উৎপাদনের এক অভূতপূর্ব উৎসাহ দেখা দিল। কলকাতার বুকে বেজে উঠল স্বদেশীর ভেরী, সমগ্র বাংলাদেশ নিনাদিত হলো সে ভেরীর শব্দে, বাংলার প্রাণকে আকুল করে তুললো। সে বাঁশী শুনে ঘর-বাড়ী ত্যাগ ক'রে সবাই ছুটে এসে দাঁড়ালো মুক্তি-যমুনার তীরে।

কিন্তু বাঙ্গালীর এই প্রতিবাদে কার্জনী সংকল্প টলল না। সমস্ত প্রতিবাদ অগ্রাহ্য ক'রে ১লা সেপ্টেম্বরে ঘোষিত হল বঙ্গ ভঙ্গ হবেই, ১৬ অক্টোবরে সত্য সত্যই বাংলাদেশ দু'ভাগ হয়ে গেল। উত্তেজনার আগুন ছড়িয়ে পড়ল সমগ্র দেশে। ছাত্রগণ স্কুল কলেজ ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়াল। বিলাতীবস্ত্র রাশিকৃত করে তাতে অগ্নি সংযোগ করা হতে লাগলো। কবির হাতের বীণা এবারে রুদ্র-বীণা হয়ে বেজে উঠল। সাহিত্যের কমল বনেও আগুনের শিখা জ্বলে উঠল। বাঙ্গালীজাতির কণ্ঠে নিনাদিত হল :—

নগরে নগরে জ্বালরে আগুন,
হৃদয়ে হৃদয়ে প্রতিজ্ঞা দারুণ।

তীব্র কষাঘাতে বাঙ্গালীর বহুদিনের মোহনিদ্রা কেটে গেল। বাঙ্গালীর জীবনে এল দুর্দমনীয় এক বন্যা প্রবাহ, এল প্রবল আবেগস্রোত। দীর্ঘনিদ্রাভঙ্গজনিত সমস্ত আবিলতা, আচ্ছন্নতা জাতীয় জীবন থেকে নিমেষে অন্তর্হিত হল। বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ

করবই—এই দুর্দম প্রতিজ্ঞা নিয়ে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল সংগ্রামে। বাঙ্গালীর অন্তরে গড়ে উঠল দেশমাতৃকার স্বর্ণমন্দির। বাঙ্গালীর সেদিনের দৃঢ় সংকল্প রূপ পেয়েছে চারণ কবির গানে—

কাঁপায়ে মেদিনী কর জয়ধ্বনি
জাগিয়া উঠুক মৃতপ্রাণ।

সত্যই বাঙ্গালীর মৃতপ্রাণ সেদিন জেগে উঠেছিল।

বিপ্লব আন্দোলন এ অনুকূল পরিবেশের সাহায্যে ক্রমে প্রসারিত হতে লাগল। সহরের প্রতি অঞ্চলে এবং প্রতি গ্রামে অনুশীলন সমিতির শাখা প্রশাখা প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল। কিন্তু সমিতির নেতৃবৃন্দ কর্মীদের এ ধরণের প্রকাশ্য আন্দোলন থেকে আলাদা রাখতেই চেষ্টা করে ছিলেন। প্রকাশ্য আন্দোলনে যখন বিলাতী বর্জনের সংকল্প গৃহীত হল, বিপ্লবীরা একে বৈশ্য আন্দোলন নাম দিয়ে এ থেকে দূরেই রইলেন। কিন্তু সরকারী দমননীতির ফলে আন্দোলন যখন বৈপ্লবিক আভায় রঞ্জিত হয়ে উঠল, যুবা বৃদ্ধ স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগলেন, বিভিন্ন শাখা প্রশাখার কর্মীদলই প্রকাশ্য আন্দোলনের কর্মী হয়ে দাঁড়ালেন। এইভাবে স্বদেশী আন্দোলনের মধ্য দিয়া বিপ্লবী সমিতি সমূহও শক্তিশালী হয়ে উঠল। অনুশীলন সমিতির পরিধি দ্রুত সম্প্রসারিত হতে লাগল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই স্বদেশীর আগুন জাতির অন্তরে স্তিমিত হয়ে পড়ল। তখন অনুশীলন সমিতি আবার নবোদ্যমে লাগল বিপ্লব আয়োজনে।

প্রমথনাথের নেতৃত্বে অনুশীলন সমিতির সভ্যদের ছোরা ও লাঠিখেলা আবার আরম্ভ হল। কিন্তু স্বদেশীর প্রধূমিত আগুন তখন জাতির অন্তরে। জাতীয় জীবন থেকে উত্তেজনার আগুন তখনও নিভে যায়নি। স্বদেশী আন্দোলনের ফলে বিপ্লবান্দোলনের প্রসারের পথ এক দিকে উন্মুক্ত হয়েছিল, অন্যদিকে এর কুফলও কিছুটা দেখা দিল। প্রকাশ্য আন্দোলনের প্রবল উত্তেজনায় পড়ে

যুবকদল নিরুত্তাপ লাঠি ও ছোরা খেলার মেতে থাকতে অস্বীকার করল। বারীন্দ্রকুমারের নেতৃত্বে এর আগে যারা একবার বিদ্রোহ করেছিলেন যতীন্দ্রনাথের পরিচালনার বিরুদ্ধে, এবারও তারাই অগ্রণী হলেন। প্রমথনাথকে তারা সুস্পষ্টভাবেই জানিয়ে দিলেন —দেশকে বিপ্লবী মনোভাবাপন্ন করতে লাঠি এবং ছোরাখেলাই যথেষ্ট নয়। বিপ্লবের নবমন্ত্র দেশময় প্রচার করতে হবে। এরজন্য চাই বাহন, চাই প্রচার পত্র। তাঁরা 'যুগান্তর' নাম দিয়ে খোলাখুলি বিপ্লববাদী কাগজ প্রকাশ করার প্রস্তাব দেন প্রমথনাথের কাছে। কিন্তু প্রমথনাথ এ প্রস্তাবে সম্মত হলেন না। তিনি বললেন, সশস্ত্র বিপ্লবের প্রস্তুতি প্রকাশ্য ঘোষণা করে চলতে পারে না। জাতীয় জীবনে বিপ্লব বইবে গোপন ধারায়, গোপন পথে চলবে এর উদ্যোগ আয়োজন। প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হলে আপনা হতেই ভূমি-কম্পের মত একদিন চৌচির হয়ে ফেটে পড়বে। জ্বালিয়ে দিবে ধ্বংসের আগুন। সমস্ত অন্যায়, অনাচার সমস্ত অশুভ পুড়ে যাবে সে আগুনে। জাতীয় জীবন তখন সে আগুনে পোড়া সোনা হয়ে খাঁটি হয়ে উঠবে। তিনি বারীন্দ্রকুমারের দলকে এপথ থেকে নিরস্ত করাব চেষ্টা করলেন। কিন্তু যুবকদল কোন কথাই মানতে সম্মত হলেন না। এ সম্পর্কে ব্যঙ্গ ক'রে প্রমথনাথ সমিতির পৃষ্ঠপোষক, সহায়ক ও কর্মীমহলে বলেছিলেন—বারীন দিস্তা দিস্তা কাগজ লিখে ভারত উদ্ধার করতে চাইছে। কিন্তু বারীন্দ্রকুমারও ছাড়বার পাত্র নন। তিনি এ কথা শুনে জবাবে বলেছিলেন—প্রেসিডেন্ট মিত্র সাহেব বাঁশের লাঠি ঘুরিয়েই দেশোদ্ধারের পালা সারবেন। ক্রমে ভিতরে ভিতরে বিভেদ সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। দেবব্রত বসু, অবিনাশ ভট্টাচার্য, বারীন্দ্রকুমার এবং ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত প্রেসিডেন্টের বাড়ীতে যাওয়া আসা ছেড়ে দিলেন। বিদ্রোহী দলের উদ্যোগে সাপ্তাহিক যুগান্তর পত্রিকা প্রকাশিত হল ১৯০৬ সালের মার্চ মাসে। অরবিন্দ তখনও বরোদা থেকে চাকুরী ছেড়ে বাংলায় এসে স্থায়ীভাবে বসেন নি।

পি. মিত্রের সঙ্গে মতান্তর সম্পর্কে বারীন্দ্রকুমার বলেন :
"১৯০৬ সালের গোড়ায় পি. মিত্র মহাশয়ের লাঠি খেলার ব্যর্থ পুনরাবৃত্তিতে আমাদের অরুচি ধরে এল। দেবব্রত ও আমি দেখলাম, এ পন্থায়ে দাগা বুলানোয় দেশ সশস্ত্র বিপ্লবের পথে এগোবে না। দেশকে সশস্ত্র বিপ্লবের মর্মকথা বোঝানো দরকার। এতদিন দু'দশজন গুপ্ত প্রচারকের দ্বারা জনে জনে যে ভাব সঞ্চারিত করা হচ্ছিল—সে উপায়েও দ্রুত দেশের মন নূতন বিপ্লবমন্ত্রের অনুকূল করে শীঘ্র গড়ে তোলা সম্ভব নয়। এই নূতন কথা, নূতন ভাব, নূতন মন্ত্রের জন্য চাই নূতন বাহন—চাই তার বাণীপত্র। সন্ধ্যার সামাজিক কৈরঙ্গী বুলি শুনতে শুনতে আমি, দেবব্রত, অবিনাশ ভট্টাচার্য এবং আমাদের জনৈক কবিরাজ বন্ধু ও মুন্সেফ অবিনাশ চক্রবর্তীর মধ্যে পরামর্শ করে স্থির হলো 'যুগান্তর' নাম দিয়ে খাঁটি সশস্ত্র বিপ্লবতন্ত্রের কাগজ বার করতে হবে। আমাদের যুগান্তরী মন্ত্রণা ক্রমে পেকে উঠলো, প্রেসিডেণ্টের আড্ডায় গমনাগমন আমরা ত্যাগ করলাম"।

অগ্নিযুগ—পৃষ্ঠা ১৪৩

ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বলেন :
"প্রমথনাথ মিত্র মহাশয় বলিতেন, ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় বৈপ্লবিক সমিতি স্থাপনের পূর্বে কয়েকবার তিনি বিপ্লব সমিতি স্থাপন করিয়াছিলেন। পূর্বে চারবার তাঁহার এই উদ্যম ব্যর্থ হয়। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মানহানি মোকদ্দমায় জেল হইলে বাহির হইতে হাজার কতক লোক লইয়া কলিকাতায় আসিয়া জেল হইতে সুরেন্দ্রনাথকে উদ্ধার করা তাহাদের দলের একটি উদ্যম ছিল। এই উদ্দেশ্যে তিনি বরিশালে গিয়েছিলেন। কিন্তু কলিকাতার নেতারা প্রতিশ্রুত সঙ্কেত না দেওয়ায় এই উদ্যম অঙ্কুরে বিলোপ প্রাপ্ত হয়।

ডাঃ দত্ত ভুল করছেন। প্রমথনাথ এই উদ্দেশ্যে বরিশালে

যাননি। তিনি তখন বরিশালেই বারিষ্টারী করতেন। বরিশাল থেকেই এরূপ একটি প্রস্তাব করে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু কলকাতার নেতারা সে প্রস্তাব অনুমোদন করেননি। সম্ভবতঃ তাঁরা এজন্য প্রস্তুত ছিলেন না।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় যখন দাদাভাই নৌরজীর সভাপতিত্বে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়েছিল ঐ সময়ই নিখিল বঙ্গ বৈপ্লবিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ওয়েলিংটন স্কোয়ারে রাজা সুবোধ মল্লিকের গৃহে! প্রমথনাথ সম্মেলনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এটাই বিপ্লব দলের প্রথম সম্মেলন।

বিভিন্ন জেলা থেকে প্রতিনিধিগণ সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। ময়মনসিংহের প্রতিনিধি ছিলেন পরেশ লাহিড়ী। পরে ইনি সন্ন্যাস গ্রহণ করে মহাদেবানন্দ গিরি নামে পরিচিত হন। ঢাকা থেকে পুলিন দাস এসেছিলেন। ত্রিপুরার প্রতিনিধিত্ব করেন নিখিল মৌলিক। নদীয়ার প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাঘাযতীনের মামা ললিত চট্টোপাধ্যায়। তিনি যতীন্দ্র নাথকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। মেদিনীপুরের প্রতিনিধি ছিলেন জ্ঞান বসু। সতীশ চন্দ্র বসু, অবিনাশ চক্রবর্ত্তী, অন্নদা কবিরাজ, অরবিন্দ ঘোষ, দেবব্রত বসু এবং ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত প্রভৃতিও সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। অবিনাশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও অন্নদা কবিরাজ পাবনার প্রতিনিধিত্ব করেন। আত্মোন্নতি সমিতির পক্ষ থেকে ইন্দ্রনাথ নন্দী উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিনিধিদের সনাক্ত করে সম্মেলনে যোগ দিতে অনুমতি দেন সভাপতি প্রমথনাথ। দিনাজপুরের প্রতিনিধি হিসাবে এসেছিলেন জনৈক বিশিষ্ট উকিল। তাঁর সনাক্ত করণের প্রশ্ন উঠলে প্রমথনাথ বলেন, "I stand guarantee for him with my life. আমি নিজের জীবন দিয়ে তাঁর জামিন আছি"।

সভাপতির বক্তৃতায় প্রথমেই প্রমথনাথ উপস্থিত প্রতিনিধিদের জিজ্ঞাসা করেন তাঁরা সবাই দলীয় শৃঙ্খলা মানতে রাজি আছেন কিনা। সবাই শৃঙ্খলা মানতে সম্মতি জানালে প্রমথ নাথ বক্তৃতা আরম্ভ করেন। বাংলার বৈপ্লবিক কর্মের সব বিভাগের কথা তিনি বলেন। 'যুগান্তর' পত্রিকা এর কয় মাস আগেই প্রকাশিত হয়েছে। প্রমথনাথ সকলকে পত্রিকাকে যথাসাধ্য সাহায্য করতে বলেন। একটি নিভৃত স্থান সমিতির পক্ষ থেকে কিনে সেখানে সামরিক শিক্ষার প্রস্তাব করেন। প্রমথনাথ এর উপর বিশেষ জোর দেন। বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধিগণ নিজ নিজ জেলায় বৈপ্লবিক কর্ম্মের ভার গ্রহণ করেন।

প্রমথনাথের বক্তৃতা সময়োপযোগী হয়েছিল। সকলেই তাঁর কথা সমর্থন করেন। সর্বকর্মের সমন্বয় সাধন করে সশস্ত্র বিপ্লবকে কি করে সার্থক করতে হবে, কিভাবে পরাধীনতার কবল থেকে মুক্ত হতে হবে, প্রমথনাথ সেই সম্পর্কেই বলেন।

১৯০৭ খৃঃ অব্দে ঐ একই স্থানে রাজা সুবোধ মল্লিকের ভবনে বৈপ্লবিক সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

এর কিছুদিন আগেই ঢাকা অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ঢাকা সমিতি প্রতিষ্ঠা এই সময়ের বৈপ্লবিক ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলার পরে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় অনুশীলন সমিতির অস্তিত্ব লোপ পায় বললেও চলে। কলকাতার সমিতি কিছুদিন সক্রিয় ছিল যতীন্দ্রনাথ মুখার্জির উদ্যোগে। কিন্তু ১৯১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বালেশ্বরে পুলিশেরসঙ্গে সংগ্রামে যতীন্দ্রনাথের আত্মদানের পর বিপ্লবী সমিতি হিসাবে পশ্চিমবঙ্গে অনুশীলন সমিতির স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব ছিল না বললেই হয়। ঢাকা অনুশীলন সমিতি এই সময়ে পূর্ব ও উত্তর বঙ্গে, এমন কি, পশ্চিমবঙ্গের অনেক জেলায় বিস্তার লাভ করে। শুধু তাই

নয়,—বিহার, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, মাদ্রাজ, কর্ণাটক প্রভৃতি সমগ্র ভারতে এই দল বিস্তৃত হয়েছিল।

বরিশালে প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯০৬ সালের গুড ফ্রাইডের ছুটিতে ১৩/১৪ এপ্রিল। এর কয়েক দিন আগে প্রমথনাথ ভারতবিশ্রুত বাগ্মী বিপিন পালকে সঙ্গে নিয়ে ঢাকা গমন করেন। তখন স্বদেশী আন্দোলনের উন্মাদনার যুগ। কিন্তু স্বদেশী প্রচার বা বঙ্গবিভাগ বিরোধী আন্দোলনের উদ্দেশ্যে প্রমথনাথ ঢাকা যাননি। প্রমথনাথের উদ্দেশ্য ছিল অনুশীলন সমিতির পূর্ববঙ্গ শাখা প্রতিষ্ঠা। এই উপলক্ষে তিনি খ্যাতনামা বিপ্লবী নেতা এবং ভারতবিখ্যাত লাঠিয়াল ও বিপ্লবী পুলিন বিহারী দাসকে আবিষ্কার করেন এবং তাঁর উপর পূর্ববঙ্গ অনুশীলন সমিতি পরিচালনার ভার অর্পণ করে আসেন। প্রমথনাথ কর্তৃক এই সময়ে সমিতি প্রতিষ্ঠা বিষয়ে পুলিন বিহারী বলেন :—

"মিটফোর্ড হাসপাতালের সম্মুখে একটি দোতলা বাড়ীতে পি. মিত্র ও বিপিন পালের বাসস্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল। ঠিক নিম্নতলে একটি পুলিশ ব্যারাক ছিল। সন্ধ্যার পরেই বিপিন পাল এবং পি. মিত্র স্বদেশী সঙ্গীত বন্দেমাতরম্ ধ্বনির সহিত বাসস্থানে উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক পরিস্থিতি আলোচনা আরম্ভ হইল। কতিপয় উকিল, যুবক এবং ছাত্রও উপস্থিত ছিল; আলোচনার মধ্যে হঠাৎ পি. মিত্র বলিয়া ফেলিলেন "এ সমস্ত স্বদেশী ফদেশী বিলাতী বর্জনে কিছুই হবে না। ক্ষমতা থাকে তো ইংরেজ তাড়াও, নয় তো মর।"

কতিপয় উকিল প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন—"এ যে অসম্ভব। একি হইতে পারে? ইত্যাদি ইত্যাদি।" পি. মিত্র উত্তেজিত হইয়া দাঁড়াইয়া দম্ভের সহিত বলিলেন, "আমরা আর ফিরিতে পারি না—The sword has been drawn, it must be thrust either in the breast of our enemies or in our own breast. তরবারি উত্থিত হয়েছে,

হয় আমাদের শত্রুর বক্ষে বিদ্ধ হবে, নয়তো আমাদের নিজেদের বক্ষে।" বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই দুই তিন বার সবেগে আপন বক্ষে করাঘাত করিলেন। অনেকেই আতঙ্কিত হইয়া উঠিলেন, কেহ কেহ—"আমরা ভাই ইহার মধ্যে নাই"—বলিতে বলিতে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। কেহ কেহ ফিস ফিস করিয়া নানারূপ বিদ্রূপ করিতে লাগিল। কিন্তু কতিপয় যুবক ও ছাত্র পি. মিত্রের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। সেই রাত্রিতেই পি. মিত্র যুবক সমিতির আহ্বানে ময়মনসিংহ চলিয়া গেলেন এবং পরের দিন বৈকালে ঢাকা ফিরিয়া আসিলেন। কতিপয় ছাত্র ও যুবক গোপনে পি মিত্রের সঙ্গে গোপন আলোচনায় প্রবৃত্ত হইল। আলোচনা সেই রাত্রে এবং পরের দিন প্রাতেও চলিয়াছিল। তারকনাথ দাস (পরে আমেরিকার পি. এইচ. ডি) পি. মিত্রের আত্মীয় এবং কলিকাতার কয়েকজন যুবক কার্তিক দত্ত প্রভৃতি যাহারা বিপ্লববাদ প্রচারহেতু পূর্ববঙ্গে ঘোরা-ফেরা করিতেছিল তাহারা এবং ময়মনসিংহের সুহৃদ সমিতির সুগায়ক ব্রজেন্দ্র গাঙ্গুলী প্রভৃতি কতিপয় যুবকও ঐ গোপন আলোচনায় যোগ দিয়াছিল। স্থির হইল, ঢাকাতে একটি বিপ্লবীদল সৃষ্টি করিতে হইবে, সমস্ত যুবক এক নেতার অধীনে উঠিবে-বসিবে, তাঁহার আদেশ বিনা বাক্য ব্যয়ে পালন করিবে।

পূর্ব-ব্যবস্থা অনুসারে পরের দিন সকালে বিপিন পাল ও পি. মিত্রের সম্মুখে বহু ছাত্র ও যুবক সমবেত হইল, কতিপয় উকিলও যোগদান করেন। আনন্দ চক্রবর্ত্তী উকিল মহাশয়কে ডাকিয়া আনা হইল। বিভিন্ন আলোচনা ও প্রস্তাবনার পর স্থির হইল—এক নেতার অধীনে বিনা বাক্যব্যয়ে তাহার সর্বরূপ আদেশ প্রতিপালন করিবে—এরূপ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়া যুবক ও ছাত্রগণকে একটি সমিতি গঠন করিতে হইবে। এইরূপ প্রতিজ্ঞায়ে আবদ্ধ হইতে প্রস্তুত আছে—জানাইয়া প্রায় ৭১ জন ছাত্র ও যুবক নাম ও ঠিকানা লিখিয়া দিল। ছাত্র

যুবকদের প্রস্তাব মত আনন্দ চক্রবর্ত্তী এই সমিতির অধিনায়ক হইলেন। ছাত্রগণের মধ্যে কেহ কেহ পূর্বে একমাত্র আনন্দ চক্রবর্ত্তীর মুখেই পি. মিত্রের বাক্যের অনুরূপ উৎসাহপূর্ণ বাক্য শুনিয়াছিল। বিপিন পাল জিজ্ঞাসা করলেন, আনন্দ চক্রবর্ত্তী যদি কোন অন্যায় আদেশ দেন, তাহাও পালন করবে তো? ছাত্র ও যুবকগণ সমস্বরে বলিয়া উঠিল—"হাঁ, করব।" পি. মিত্র ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন—এস্থলে অন্যায় অর্থে বুঝিতে হইবে। আপাতদৃষ্টিতে অন্যায় কিন্তু পরিণামে শুভ ফলদায়ী। তোমাদের মানিয়া লইতে হইবে, যাঁহাকে তোমাদের অধিনায়ক করিলে তিনি কখনও তোমাদের কিম্বা তোমাদের দেশের অনিষ্ট কামনা করিতে পারেন না। আনন্দ চক্রবর্ত্তীও সামান্য বক্তৃতা এবং উপদেশ দিয়া ছাত্র ও যুবকগণকে তাহাদের কর্ত্তব্য বুঝাইয়া দিলেন। তৎপরে প্রশ্ন উঠিল—সমিতির পরিচালক কে হইবে? দুইটি সুস্থকায় দীর্ঘাকৃতি (যোগেন্দ্র নাগ ও নিশি চৌধুরী) আমার নাম প্রস্তাব করিল। (এতক্ষণ আমি দর্শকমাত্রই ছিলাম, আলোচনাস্তেও যোগ দেই নাই, আনন্দ চক্রবর্ত্তীকে চিনতাম না)। কিন্তু আমার দীনবেশ ও ক্ষীণদেহ দেখিয়া এবং আমি নির্জীবের মত জড়বৎ বসিয়া রহিয়াছি দেখিয়া পি. মিত্র উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"না, না, এর মত লোক আমি চাই না। আমি চাই তোমাদের (নিশি ও যোগেন্দ্র) মত যুবক, যে একটি মাত্র বাক্যের দ্বারা অপর সকলকে বশে রাখিতে পারিবে।" কিন্তু নিশি ও যোগেন্দ্র কহিল, "ইনি ভিন্ন আর কেহই তাহা পারিবে না।" পি. মিত্র তখন অন্যান্য যুবকদের জিজ্ঞাসা করিয়া একই উত্তর পাইলেন। তৎপরেও তিনি নিশি এবং যোগেন্দ্রকে বলিলেন, "তোমাদের দুই জনের মধ্যে একজন পরিচালক হও।" কিন্তু তাহারা বারংবারই আমার নাম করিতে লাগিল। তখন পি. মিত্র নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেই আমাকে পরিচালক করিতে স্বীকৃত হইলেন। নিশি চৌধুরী পরে হাজারিবাগে ডাক্তার হইয়াছিলেন।

যোগেন্দ্র নাগ আমেরিকা ঘুরিয়া আসিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে কৃষি বিদ্যার অধ্যাপক হইয়াছিল।

তৎপরে প্রশ্ন উঠিল, সমিতির নাম কি হইবে? কেহ কেহ বলিল 'বান্ধব সমিতি', কেহ বলিল—'বন্দেমাতরম সমিতি' ইত্যাদি। পি. মিত্র বলিলেন, আমি কলকাতার সমিতির নাম দিয়েছি অনুশীলন সমিতি, তোমরা সেই নামই দাও—তবেই বঙ্গদেশময় একনামে একটি বিরাট শক্তিশালী সমিতি গঠিত হইবে। বঙ্কিম বাবুর অনুশীলন সমিতির প্রবন্ধ হইতেই আমি এই নামটি গ্রহণ করিব। তাই এই সমিতির নাম অনুশীলন সমিতি হইল। পি. মিত্র সমিতির অধ্যক্ষ হইলেন।

(বিপ্লব যুগের কথা—পুলিন বিহারী দাস)

ঢাকা অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পরে পরবর্ত্তী নভেম্বর মাসে পি. মিত্র পুলিন বিহারীকে কলকাতায় ডেকে পাঠালেন। বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতির নিয়মানুসারে পুলিন বাবুকে যথারীতি দীক্ষা গ্রহণ করতে হবে। পুলিন বাবু কলকাতা অনুশীলন সমিতির কার্য্যালয় ৪৯ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে গিয়ে উঠলেন এবং কলকাতা সমিতির পরিচালক সতীশ বাবুর অতিথি হলেন। পি. মিত্রের বাসস্থান ছিল ১২১নং লোয়ার সার্কুলার রোডে।

পুলিন বিহারী তাঁর দীক্ষার বিবরণে বলেন: "পি মিত্রের আদেশ মতে একদিন একবেলা হবিষ্যান্ন আহার করিয়া সংযমী থাকিয়া পরের দিন গঙ্গাস্নান করিয়া পি. মিত্রের বাড়ীতে দীক্ষা লইলাম। ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, পুষ্প চন্দনাদি সাজাইয়া ছান্দোগ্য উপনিষদ হইতে বৈপ্লবিক মন্ত্র পাঠ করিয়া পি. মিত্র যজ্ঞ করিলেন। পূরে আমি অলিয়াসনে বসিলাম। আমার মাথার উপর অসি রাখিয়া উহা ধরিয়া পি. মিত্র আমার দক্ষিণে দণ্ডায়মান রহিলেন. উভয় হস্তে ধারণ করিয়া যজ্ঞাগ্নির সম্মুখে কাগজে লিখিত প্রতিজ্ঞাপত্র পাঠ করিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলাম। পরে যজ্ঞাগ্নিকে ও পি. মিত্রকে নমস্কার করিলাম"।

দীক্ষা নিয়ে পুলিন বিহারী প্রমথনাথের নির্দেশে কিছুদিন কলকাতাতেই ছিলেন। কলকাতার বিভিন্ন ক্লাবের লাঠিখেলা পদ্ধতি দেখলেন। লাঠিখেলা পুলিন বিহারীর নিকট নূতন নয়। ১৯০৪ সালে লর্ড কার্জন যখন ঢাকায় যান তাঁকে লাঠিখেলা দেখাবার জন্ম শ্রীরামপুর থেকে প্রসিদ্ধ লাঠিয়াল মার্ত্তাজা সাহেবকে নিয়ে যাওয়া হয়। মার্ত্তাজা সাহেব বেশ কিছুদিন ঢাকায় ছিলেন। পুলিন বিহারী ঐ সময় তাঁর কাছ থেকে লাঠিখেলা শিখে নেন।

কলকাতা থেকে পুলিন বিহারী যখন ঢাকা আসেন প্রমথনাথ তখন তাঁর হাতে আনন্দ চক্রেবর্তীর নিকট এক পত্র দেন। ঐ পত্রে জানান, পুলিন বিহারীকে অনুশীলন সমিতির Executive Commander নিযুক্ত করা হয়েছে। ঢাকায় ফিরে এসে পুলিন বিহারী নূতন উদ্যমে কার্য আরম্ভ করলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই অনুশীলন সমিতি ঢাকা, বরিশাল, ফরিদপুর, কুমিল্লা ও নোয়াখালি জেলায় সম্প্রসারিত হল। পরবর্ত্তী তিন বৎসরের মধ্যে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন গ্রামে এবং উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং আসামেরও বিভিন্ন অঞ্চলে অনুশীলন সমিতির শাখা-প্রশাখা স্থাপিত হল। এই সময়ে ঢাকা সমিতির শাখা-সমিতির সংখ্যা ছিল ছয় শতেরও অধিক। পুলিন বিহারী এই সমস্ত শাখা-সমিতি পরিচালনার জন্ম পরিদর্শক নিযুক্ত করেছিলেন। কেন্দ্রীয় ঢাকা সমিতি থেকে পরিদর্শকগণ শাখা-সমিতিতে গিয়ে সেখানকার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে আসতেন। তা'ছাড়া শাখা-সমিতিকে ও মূল সমিতির নিকট প্রতি মাসে একটা রিপোর্ট পাঠাতে হত। সংগঠনকারী হিসাবে বিপ্লবী সমিতিতে পুলিন বিহারী অতুলনীয়। তাঁর সংগঠন গুণে ঢাকা সমিতি অচিরে এক শক্তিশালী বিপ্লবীসংগঠন ব'লে সমগ্র ভারতে পরিচিত হল।

এইভাবে সমবেত উদ্যোগে ঢাকা এবং কলকাতা অনুশীলন সমিতির কাজ চলতে লাগল। কিছুদিন পরে পি. মিত্র এক

মোকদ্দমা উপলক্ষে ময়মনসিংহ গিয়েছিলেন। কলকাতা ফেরার পথে তিনি ঢাকায় দুই-একদিন অবস্থান করেন। ঐ সময়ে তিনি ১৫নং পটুয়াটুলীতে কয়েকজন তরুণ উকিল কর্ত্তৃক স্থাপিত দরিদ্র সমিতিতে ছিলেন। তিনি পুলিন বিহারীকে এখানে ডেকে আনেন এবং সমিতির কাজ কত দূর অগ্রসর হয়েছে দেখতে বলেন। আদেশ পাওয়া মাত্র যথাসম্ভব ক্ষিপ্রতার সহিত পুলিন বিহারী বিভিন্ন শাখা-সমিতিতে সংবাদ পাঠিয়ে এবং সকলকে একত্র ক'রে ড্রিল, আক্রমণ, প্রতিরোধ প্রভৃতি লাঠিখেলার নানাদিক অতি সুন্দরভাবে মিত্র সাহেবকে দেখালেন। পুলিন বিহারী কলকাতা থেকে সম্প্রতি ঢাকা এসেছে। এই অল্প সময়ের মধ্যে সমিতির কার্য্যকলাপের এই অগ্রগতি দেখে মিত্র সাহেব খুবই সন্তুষ্ট হলেন। সমস্ত দেখে বিমুগ্ধচিত্তে তিনি মন্তব্য করলেন, "পুলিন অদ্ভুত কর্ম্ম সম্পাদনা করেছে। মাত্র এক মাসের মধ্যে এতদূর অগ্রসর হওয়া বাস্তবিকই গৌরবের বিষয়।

পুলিন বিহারীকে ডেকে তিনি বলেন, "যারা অধিক কথা বলে কিংবা বক্তৃতা দেয়, তাদের কর্মক্ষমতা কমে যায়।" তিনি পুলিন বিহারীকে প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা দিতে নিষেধ করেছিলেন। পুলিন বিহারী এই নির্দ্দেশ যথাসম্ভব পালন করে চলতেন। পরে পুলিন বাবু কলকাতা গেলে প্রমথনাথ তাঁর সঙ্গে প্রাণখোলাভাবে কথা বলেন। পুলিন বিহারীকে তিনি বলেন, "এই সমস্ত সাংগঠনিক ব্যাপারে তোমার মাথা খেলে। তাই এখন থেকে সমিতির পরিচালনা ব্যবস্থা সম্পর্কে তুমি যা' ভাল মনে করবে তাই করবে। আমি তোমাকে সর্বময় ক্ষমতা অর্পণ করলাম। বিশেষ কোন কারণ না ঘটলে আমার সঙ্গে পরামর্শের কোন প্রয়োজন নাই।"

পুলিন বিহারী ঢাকা ফিরে যাওয়ার কিছুদিন পরে কলিকাতায় শিবাজী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সর্বভারতীয় বৈপ্লবিক সঙ্ঘের বহির্বঙ্গে নেতা ছিলেন মহারাষ্ট্রের তিলক এবং মধ্য প্রদেশের খাপার্দে' এবং ডঃ মুঞ্জে। এ সময়ে তাঁরা কলকাতায় আসেন।

শিবাজী উৎসব উপলক্ষে প্রমথনাথ ঢাকা থেকে পুলিন বিহারীকেও কলকাতায় ডেকে আনেন। নিজ গৃহে নেতৃত্রয়ের সঙ্গে প্রমথনাথ বৈপ্লবিক সংগঠন সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেন। প্রমথনাথ নেতাদের সঙ্গে পুলিন বিহারীর এই আলোচনা সম্পর্কে পুলিন বিহারী লিখেছেন—

"একদিন তিলক, খাপার্দে এবং মুঞ্জে পি. মিত্রের সঙ্গে তাঁর বাসাতে অনেক গুপ্ত আলোচনা করলেন। আমি দ্বার রক্ষক ছিলাম। আনন্দ চক্রবর্ত্তী বাহিরে ছিলেন। অন্য কাহারও প্রবেশাধিকার ছিল না। উচ্চ প্রশংসা সহ পি. মিত্র আমাকে তিলক প্রভৃতির সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলেন। গুপ্ত আলোচনা শেষ হইলে 'দেশের কথা' গ্রন্থকর্ত্তা সখারাম গণেশ দেউস্করের সঙ্গেও আমার পরিচয় হইল। তিলক বলিয়া ছিলেন, ভারতের হিন্দুগণকে একজাতিতে পরিণত করিতে হইলে সর্বত্র দেবনাগরী অক্ষর প্রচলন করিতে হইবে, পরে সংস্কৃত ভাষার ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রদেশের হিন্দুগণের বিভিন্ন ভাষাকে মিলিত করিয়া একটি জাতীয় ভাষা সৃষ্টি করিতে হইবে" (বিপ্লবের কথা)

পুলিন বিহারী কলকাতায় অবস্থানকালে প্রমথনাথ, সতীশ চন্দ্র বসু এবং পুলিন বিহারীর মধ্যে আলোচনার পরে সমিতির প্রতিজ্ঞাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। পূর্বে সমিতিতে প্রবেশার্থী সকলকেই একরূপ প্রতিজ্ঞা করতে হত। কিন্তু এবারে স্থির হল—নূতন সদস্যদের আদ্যপ্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে হবে। কিছুদিন পরে তারা মধ্য প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করবে। যাদের যোগ্য বিবেচনা করা হইবে তাদেরই অন্ত্য প্রতিজ্ঞায় দীক্ষিত করা হবে। এ ছাড়া আরও স্থির হলো, যারা বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতির কার্য্য কলাপ যেমন,—অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ, বলপূর্বক অর্থ সংগ্রহ, দেশের অনিষ্টকারী এবং সমিতির অনিষ্টকারীদের হত্যা প্রভৃতি দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের সঙ্গে যুক্ত থাকবেন, তারা সমিতির অন্যান্য সদস্যদের থেকে স্বতন্ত্র থাকবেন, সকলের নিকট তারা পরিচিত হবেন না।

পুলিন বিহারী ফিরে গিয়ে প্রমথনাথের আদর্শ অনুযায়ী সমিতির সদস্যদের দীক্ষা দিতে লাগলেন। সমিতির প্রতিজ্ঞাকে তিনি আরও একটি ভাগ ক'রে, 'আদ্য', 'মধ্য' ও 'অন্ত' প্রতিজ্ঞা করলেন। পূর্ববঙ্গ সমিতির সমস্ত কার্য্যকলাপের বিষয় তিনি প্রমথনাথকে জানাতেন এবং প্রয়োজন বোধ করলেই তিনি প্রমথনাথের পরামর্শ নিতেন। এজন্য তিনি মাঝে মাঝে কলকাতায় বিশ্বস্ত কর্মীদের পাঠাতেন। তারা এসে কলকাতার কেন্দ্রীয় কার্য্যালয় ৪৯নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে উঠতেন এবং সতীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে কথাবর্ত্তা ব'লে প্রমথনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন এবং প্রয়োজনীয় বিষয়ে পরামর্শ নিয়ে ঢাকা গিয়ে পুলিন বিহারীকে জানাতেন।

স্বদেশী যুগে বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করা হলে পূর্ববঙ্গের লাট হলেন স্যার ব্যাম্ফিল্ড ফুলার। পূর্ববঙ্গে আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করলে ফুলার সাহেব অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দিলেন। আন্দোলন দমনের জন্য তিনি মুসলমানদের ক্রমাগত হিন্দুদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে লাগলেন। এর ফলেই কুমিল্লা এবং ময়মনসিংহের জামালপুর অঞ্চলের মুসলমানগণ উত্তেজিত হয়ে হিন্দুদের আক্রমণ করে এবং কয়েকটি বিগ্রহ ভেঙ্গে ফেলে। অনুশীলন সমিতির স্থানীয় সদস্যগণ এই সময়ে বিপন্নদের সাহায্য করেন এবং দাঙ্গা দমনে অংশ গ্রহণ করেন।

প্রমথনাথ চাইতেন দেশের স্বাধীনতা। এজন্য তার লক্ষ্য ছিল সশস্ত্র বিপ্লব। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই তিনি বিপ্লবী-সংগঠন অনুশীলন সমিতি সৃষ্টি করেছিলেন। অন্য প্রকার আন্দোলনে তা নরমপন্থী হোক, গরমপন্থী হোক বা চরমপন্থীই হোক তাতে তাঁর বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু তাই বলে প্রয়োজন হলে যে বিপন্নের সাহায্যে যেতেন না তা' নয়। ১৯০৬ সালের ১৭ই আশ্বিন বড়বাজারে পিকেটিং করতে গিয়ে পিকেটিংকারীদের সঙ্গে পুলিশের এক সংঘর্ষ হয়। বড়বাজার থানার ইন্সপেক্টর কেরল সাহেব পিকেটিংকারী ছাত্র ও যুবকদের প্রহার করেন তার কনষ্টেবলদের

দিয়ে। এর ফলে তিনি নিজেও প্রহৃত হন। ১৭ জন ছাত্র ও যুবকদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ থানায় নিয়ে যায়। ধৃত ব্যক্তিদের উদ্ধারের জন্য পি. মিত্র থানায় গিয়েছিলেন। প্রমথনাথ ছিলেন কর্মীদের নেতা। কর্মীরা তাঁর প্রিয় ছিল।

বিভিন্ন রাজনৈতিক মামলায় তিনি আসামী পক্ষ সমর্থন করতেন। ১৯০৮ সালের ৩০শে এপ্রিল মজঃফরপুরের বোমা বিস্ফোরণে মিসেস কেনেডী ও মিস কেনেডী নিহত হন। এই ঘটনার সূত্রধরে কলকাতার অরবিন্দ, বারীন্দ্রকুমার প্রভৃতি গ্রেপ্তার হন ২রা মে। কয়েকদিন পরে বিভিন্ন স্থান থেকে বহু বিপ্লবী কর্মীকে গ্রেপ্তার ক'রে আলিপুর বোমার মামলায় অভিযুক্ত করা হয়। প্রমথনাথ অভিযুক্তদের মধ্যে হেমচন্দ্র কানুনগো, অশোক নন্দী এবং আরও ৬ জনের পক্ষ সমর্থন করেছিলেন। দণ্ডিত আসামীদের পক্ষে হাইকোর্টেও তিনি মামলা পরিচালনা করেন।

অনুশীলন সমিতি পরিচালনার আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন প্রমথনাথ। তিনি নিজে এজন্য মাসিক ৩০ টাকা হিসাবে দিতেন এবং অন্যান্য বন্ধুবান্ধবদের নিকট থেকে অর্থ সংগ্রহ করে দিতেন। সমিতি পরিচালনার জন্য বিপুল অর্থের প্রয়োজন হওয়াতে তিনি ডাকাতিতে সম্মতি দেন। কিন্তু কিছু কর্মী এই সুযোগে পাড়ায় ডাকাতি করে বসল। এক ফিরিঙ্গিকে রাস্তায় ধরে তার টাকা ছিনিয়ে নেওয়া হল। এর আগে তারকেশ্বরে এই ধরণের ডাকাতি হয়। এই সম্পর্কে প্রমথনাথের গৃহে তল্লাসী হয়। কিন্তু পুলিশ কোন প্রকার সন্দেহজনক বা বে-আইনী কোন দ্রব্য পায় নাই।

১৯১০ খৃঃ অব্দের প্রথমভাগেই পুলিন বিহারীকে মণ্টোগোমারী জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হলো। এর আগেই অনুশীলন সমিতি বে-আইনী ঘোষিত হয়েছে। জুলাই মাসে পুলিন বিহারী প্রভৃতি ৪৭ জনকে গ্রেপ্তার ক'রে সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধের

আয়োজন অভিযোগে এক ষড়যন্ত্রের মামলা দায়ের করা হয়। বিপ্লবের ইতিহাসে এই মামলা ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলা নামে খ্যাত। পরে আরও ৮ জনকে আসামীশ্রেণীভুক্ত করা হয়। ১৯১০ সালের ২২ নভেম্বর ৪৪ জনকে দায়রা সোপর্দ্দ করা হলো। ১৯১১ সালের ৭ আগষ্ট ৩৬ জন দণ্ডিত হলেন। হাইকোর্টে আপিল করা হলে পুলিন বিহারী ও অন্যান্য ১৩ জনের দণ্ডের কোন পরিবর্ত্তন হল না। অন্যান্য আসামীদের দণ্ড কিছুকিছু হ্রাস পেল। ষড়যন্ত্র মামলায় আসামীদের পক্ষ সমর্থন করেন চিত্তরঞ্জন দাস। সরকারের পক্ষের উকিল পি. এল. রায় মামলার উদ্বোধনী বক্তৃতায় বলেন যে, বৃটিশ রাজত্বের উচ্ছেদ সাধন ক'রে তিলককে ভারত সম্রাট এবং পি. মিত্রকে বড়লাট করাই অনুশীলন সমিতির উদ্দেশ্য। সুতরাং পি. মিত্রের প্রতি যে সরকার পক্ষের লক্ষ্য একেবারেই ছিল না তা নয়। কিন্তু তারা প্রমথনাথের বিরুদ্ধে উপযুক্ত তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারেনি।

পুলিন বিহারী ও তার সঙ্গীদের ঢাকায় গ্রেপ্তারের সংবাদেই প্রমথনাথের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। গ্রেপ্তারের পর মাসাধিক কালের মধ্যেই ১৯১০ সালের ১০ আগষ্ট প্রমথনাথ সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হন। দুই সপ্তাহের চিকিৎসায় তিনি কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠেন। তিনি শয্যা থেকে উঠে বসতে পারতেন এবং একটু আধটু হাটতেও পারতেন। কিন্তু এই অসুস্থ অবস্থায়ও ঢাকা কর্মীদের চিন্তা তিনি ত্যাগ করতে পারেননি। ষড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কে আলোচনার জন্য তিনি রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাড়ীতে ডেকে পাঠালেন। চিকিৎসকগণ তাঁকে খুব বেশী কথাবার্ত্তা বলতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু প্রমথনাথের আহ্বানে সুরেন্দ্রনাথ বাড়ীতে এলে তিনি এক ঘণ্টারও অধিককাল পুলিন বিহারী এবং অন্যান্য আসামীদের পক্ষ সমর্থন বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেন। কথা হল, এক

সপ্তাহ পরে সুরেন্দ্রনাথ আবার আসবেন। তখন মামলা পরিচালনা সম্পর্কে আরও আলোচনা হবে। কিন্তু প্রমথনাথ সে সুযোগ আর পান নাই। এক সপ্তাহকাল অতীত হবার আগেই প্রমথনাথ দ্বিতীয়বার আক্রান্ত হলেন। এবারে রোগ মারাত্মক হয়ে উঠল। ১৯১০ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা এবং বিপ্লবী সর্বাধিনায়ক প্রমথনাথ মিত্রের জীবন-দীপ নিভে গেল। শেষ মুহূর্ত্ত পর্যন্ত তাঁর জ্ঞান অটুট ছিল। মৃত্যু আসন্ন তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে তাঁর মুখের কথা—

"I feel my end is approaching. Do convey to my dear Pulin and my other Dacca boys now undergoing trial that my last thoughts are with them."

"আমি বুঝতে পারছি যে, আমার অন্তিম কাল আসন্ন। আমার প্রিয় পুলিন এবং ঢাকায় আমার প্রিয় অন্যান্য বিচারাধীন ছেলেদের জানিও যে, তাদের চিন্তা নিয়েই আমি প্রাণত্যাগ করছি।"

অনুশীলন সমিতি এবং সমিতির মাধ্যমে দেশসেবা প্রমথনাথের কত প্রিয় ছিল তাঁর মৃত্যুকালীন এই উক্তিই তার প্রমাণ। মৃত্যু-যন্ত্রণাও তাঁকে তাঁর প্রিয় মুক্তিসাধকদের ভুলতে দেয়নি। দেশ-হিতব্রতে সর্বস্ব সমর্পণের মন্ত্র যাদের তিনি এতদিন শুনিয়েছেন, দেশে মুক্তিসাধনায় যারা ছিলেন তাঁর সহকর্মী এবং অনুচর, তাঁদের কথা তাঁর বার বার মনে হয়েছে।

মৃত্যুর পূর্বে তিনি শেষ কথা প্রকাশ করে যান যে, অনুশীলন সমিতির কর্মীরা যেন তার মৃতদেহ বহন করে শ্মশানে নিয়ে যান এবং তারাই যেন তার শেষকৃত্য সমাপন করে। প্রমথনাথের শেষ ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছিল। কলকাতার অনুশীলনের পরিচালক সতীশ চন্দ্র বসুর নেতৃত্বে অনুশীলন কর্মীরাই শবদেহ সৎকার করবার ব্যবস্থা করেন।

অনুশীলন সমিতির সঙ্গে তার প্রতিষ্ঠতার সম্পর্ক এত নিবিড় ছিল যে, আজিও তার নাম করতে হলে বলা হয় অনুশীলন সমিতির পি. মিত্তির।

ঢাকায় অনুশীলন সমিতি স্থাপনে পুলিন বিহারীর সহকর্মী শ্রীআশুতোষ দাসগুপ্ত বলেন, "১৯০৬ সালের ইষ্টারের ছুটিতে বরিশালে প্রাদেশিক সম্মেলনের কয়েকদিন আগে বিপিন চন্দ্র পালকে সঙ্গে নিয়ে প্রমথনাথ ঢাকা নগরীতে পদার্পণ করেন। বুড়ীগঙ্গার তীরে জমিদার সনাতন বাবুর ঠাকুরবাড়ীর প্রাঙ্গনে প্রথমদিন বক্তৃতা করেন বিপিনচন্দ্র। তৃতীয় দিনে বাবুর বাজার পুলিশ সেকশনের উপর তলায় এক সুবিস্তীর্ণ কক্ষে ছাত্রসভা আহূত হয়। এখানেও বিপিন বাবুই প্রথম বক্তৃতা দিলেন। তিনি ঢাকায় অনুশীলন সমিতির ভিত্তি স্থাপন সম্পর্কে সময়োচিত কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপস্থিত ছাত্রদিগকে উপদেশ দিলেন। ঢাকার উকিল আনন্দ চক্রবর্ত্তীকে সভায় ডেকে আনা হয়েছিল। আলোচনান্তে তিনি নেতৃপদে বৃত হলেন। উপস্থিত ছাত্রগণ সকলেই একবাক্যে অনুশীলন সমিতিভুক্ত হবেন ব'লে স্বীকার করেন। ঐ দিনেই শতধিক নাম লিখিত হল। অস্থায়ীভাবে সম্পাদক হলেন ভূপেশ নাগ। পরিচালক নিযুক্ত হন পুলিন বিহারী দাস"

১৯০৮ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুশীলন সমিতির পরিচালক পুলিন বিহারী এবং তাঁর সহকর্মী ভূপেশ নাগ গ্রেপ্তার হন। বিনা বিচারে তাঁদের আটক রাখা হয়। অনুশীলন সমিতিকেও বে-আইনী ঘোষণা করা হয়। সুতরাং কর্মীদের গা ঢাকা দিয়ে কাজ করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এজন্য আশুতোষ দাসগুপ্ত প্রভৃতি নেতৃ-স্থানীয় কর্মীরা কলকাতায় চলে আসেন। এই সময় সম্পর্কে আশুবাবু লিখেছেন, "সেই সময়ই মিত্র মহশেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আমার বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পঠদ্দশায়ই ১৯০৭ খৃঃ অব্দ হইতে আমি মিত্র মহাশয়ের সঙ্গে পরিচিত হইয়াছিলাম। সমিতির গৃহীকর্মীরূপে তখন একটিবার মাত্র সাক্ষাৎ করেছিলাম। মাঝে

মাঝে আমাকে ২।৩ বার তাহার বাড়ীতে নির্ধারিত সময়ে যাইতে বলেন ভাল করিয়া চিনিবার জন্ত। আমাকে পরীক্ষা করিবার জন্ত তখন এত ঘন ঘন তাহার সঙ্গে দেখা করিতে বলিতেন। আমি তখন মীর্জাপুর ষ্ট্রীটের কাছে কানাই ধর লেনে এক মেসে থাকিতাম। মিত্র মহাশয়ের বাসা ছিল লোয়ার সার্কুলার রোডে ট্রাম ডিপো পার হইয়া সাহেবদের কবর-খানার কাছে। আমি হাটিয়াই যাইতাম। একদিন তিনি আমাকে বলিলেন, "আশু, তুমি যোগাভ্যাস করনা কেন? আমি তোমাকে যোগশিক্ষা দেব।" সেইদিনই তিনি চতুর্বর্গ যোগ শিক্ষা আমাকে দিলেন। দীক্ষা দিবার আগে বললেন, "আজ যে দীক্ষা তোমাকে দিচ্ছি, সেজন্ত তোমাকে গুরুদক্ষিণা দিতে হবে, আমার কাজ করে। ভারতের স্বাধীনতা অর্জনই হবে গুরুদক্ষিণা।"

প্রমথনাথ বিশ্বাস করতেন, ভারতের স্বাধীনতা কেবলমাত্র অস্ত্র সাহায্যেই হবে না। তপস্তালব্ধ শক্তি সংগ্রহ করতে হবে কর্মীদের। যেমন অর্জ্জুনকে দ্রোণাচার্য্যের নিকট অস্ত্রশিক্ষা করে পাশুপত অস্ত্রলাভের জন্ত তপস্তা করতে হয়েছিল।

এইজন্তই বিপ্লবীদের পক্ষে যোগশিক্ষা প্রয়োজন। তিনি এ সম্পর্কে নিজের জীবনের এক ঘটনা আশু বাবুকে বলেছিলেন—

"একবার পূজা উপলক্ষে হাইকোর্ট ছুটি হইলে দিল্লীতে বেড়াইতে যাই। ভাদ্র মাস—রৌদ্রের তেজ বড় কম নয়। পায়ে হাটিয়া ঘুরিয়া সব দেখিতাম। পুরাতন দিল্লী অনেকক্ষণ ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঠিক দুপুরবেলা বেশ ক্লান্ত হইয়া একটি সিংহদ্বারে দাঁড়াইয়া বিশ্রাম করিতেছি। সম্মুখে বিস্তৃত রাজপথ। পথে লোকজন নাই। সেই দুপুরের রৌদ্রে অন্তমনস্কচিত্তে দিল্লীর সব প্রাচীন কাহিনী ভাবিতেছি—এই সেই দিল্লী, যেখানে মোগল পাঠান বাদশাহগণ রাজত্ব করিয়াছেন, তখন ইহা কিরূপ সমৃদ্ধ ছিল। এ পর্য্যন্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া যে সকল জিনিস প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম, একে একে সব মনে পড়িতে লাগিল। ভাবিতেছিলাম, মুসলমানগণ

বিদেশাগত হইলেও এদেশে বাস করিয়া ভারতবাসীই হইয়া গিয়াছিল। ভাবিতেছিলাম টোডরমল, মানসিংহ, মোঘল সাম্রাজ্যের উচ্চতম পদে আসীন ছিলেন। আজ যোগ্য হইলেও কত, অর্থ ব্যয় করিয়া, কত শ্রম করিয়া, কষ্ট স্বীকার করিয়া সাত-সমুদ্র তের-নদী পার হইয়া সিভিল সার্ভিস পাশ করিয়া আসিলেও কত সামান্য হীন পদে স্থাপিত হইতেছে ভারতবাসী। ধিক্ ভারতবাসীর জীবন! আবার ভাবিতেছিলাম, কি কুক্ষণে দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ সংযুক্তার স্বয়ংম্বর সভা হইতে সংযুক্তাকে বলপূর্বক কাড়িয়া লইয়া অন্তর্হিত হইলেন। নতুবা ভারত মহম্মদ ঘোরীকে ডাকিত না। আবার ভাবিতেছিলাম, ঘোরীর মিথ্যা ব্যবহারে সরল পৃথ্বীরাজ যদি আস্থা স্থাপন না করিতেন হয়ত চিরকালই ভারত স্বাধীন থাকিত। হায় দিল্লী! তুমিই তো প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থ। তুমিই সেই রাজসূয় যজ্ঞবেদী সভামণ্ডপ বক্ষে ধারণ করিয়াছিলে। হায়! তুমি আজ শ্মশানপ্রায়। এইরূপ কত কি ভাবিতেছি, এমন সময়ে ঠক্‌ঠক শব্দ কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিল। অশ্ব-ক্ষুর ধ্বনি মনে হইল। চাহিয়াই দেখি, সত্যই একদল অশ্বারোহী আমার সম্মুখের রাজপথ দিয়া চলিয়াছে। তাহাদের বেশভূষা অদ্ভুত, প্রত্যেকের শিরোদেশে উজ্জ্বল জরীর কাজ করা উষ্ণীষ, রক্তবর্ণ বর্ম পরিহিত। প্রত্যেকের কটিদেশ হইতে অসিকোষ লম্বিত। দক্ষিণ হস্তে বর্শা, বাম হস্তে অশ্বরজ্জু, বর্শা-ফলকগুলি সৌরকরে উদ্ভাসিত। প্রত্যেকেই দীর্ঘসুপুরুষ, বলিষ্ঠদেহ এবং প্রফুল্লবদন। দেখলেই মনে হয়, সকলেই যেন বিজয়গর্বে উন্নত। এ পর্যান্ত ঠক্‌ঠক্ শব্দ ছাড়া আর কিছুই শুনি নাই। সর্বশেষ অশ্বারোহী আমাকে অতিক্রম করিয়াই কয়েকটি কথা বলিল—"যোগসে হোগা নেই হোগা তরবারীসে।" কথাটার অর্থ—দুরকম হতে পারে। অর্থাৎ যোগদ্বারা হবে না। তরবারি দ্বারা হবে। কথাটার উচ্চারণের দিকে লক্ষ্য রাখিলে উহা অর্থমীমাংসার কাজ সহজ হইত। কিন্তু অশ্বারোহীর বাক্যটির দিকে

অর্থপূর্ণ মনোযোগ দিতে পারি নাই।

আশু বাবু বলেন, মিত্র সাহেব 'নেই' কথাটি পরবর্ত্তী বাক্যাংশের সহিত যুক্ত করেই ধরে নিয়েছিলেন। কারণ তার সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমি দেখেছি যোগেই তিনি আস্থাবান।

ভগিনী নিবেদিতার জীবনের অনুরূপ একটি ঘটনা প্রমথ নাথের জীবনের উপর কিছুটা প্রভাব বিস্তার করতে পারে। এ সম্পর্কে প্রমথনাথ নিজেই বলছেন, "ভগিনী নিবেদিতা মধ্যে মধ্যে আমার কাছে আসতেন। নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা হতো। তার মধ্যে একদিনের কথা আমার বিশেষ মনে আছে। নিবেদিতা বললেন—"দেখুন পি. মিত্র, কুরুক্ষেত্র দেখবার আমার খুব সাধ হল। তাই সারাদিন কুরুক্ষেত্রের ময়দানে ঘুরে ঘুরে দেখলাম। পরে আশ্রয় নিলাম নিকটস্থ ডাকবাংলোয়। রাত্রিতে, একখানা আরামকেদারায় বসে গীতা পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছি। রাত দুপুরে হঠাৎ জেগে গেছি। কুরুক্ষেত্রের দিক থেকে একটি শব্দ আমার কানে আসল। সেই গম্ভীর শব্দ যেন সংস্কৃত শ্লোকের আবৃত্তি হচ্ছে ব'লে মনে হল। আমি ভাবলাম স্বপ্ন দেখছি না তো! ভেবে চোখদুটো রগড়ে উঠে বসলাম। আবার শুনলাম তাই। তখন বের হয়ে কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরের নিকটবর্ত্তী হতেই স্পষ্ট শুনতে পেলাম—গীতার সেই শ্লোকদ্বয়। চতুর্থ অধ্যায়ের :—

যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায়চ দুস্কৃতাম্
ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

এই চারিটি পংক্তি একবার নয়, পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি হচ্ছে। ভাবলাম, কে এই রাত দুপুরে এই শ্লোক এখানে আবৃত্তি করছে। যে দিক হতে শুনতে পাচ্ছিলাম সেই দিকে চললাম। যেতে যেতে প্রান্তরের কেন্দ্রের দিকে যতই যাই, ততই যেন স্পষ্টতর

শুনি। মনে হয় যেন চারদিক থেকেই একই শব্দ যুগপৎ হচ্ছে। সে কি শব্দ! অতীব গুরু গম্ভীর, অতীব স্পষ্ট। আপনি ওদিকে গেলে এক রাত্রি থাকবেন ওখানে। এই ঘটনার পর থেকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ আমার নিকট সত্য, অর্জুন আমার নিকট সত্য এবং যুদ্ধক্ষেত্রে যে গীতা প্রথম উচ্চারিত হয়েছিল—এ সবই সত্য ব'লে ধারণা হয়েছে আমার। শ্রীকৃষ্ণের সত্যতা তো স্বামীজীই প্রমাণ করে গেছেন।"

এ থেকে আমরা ভগিনী নিবেদিতারও আর একটি নূতন পরিচয় পাই। তিনি তাঁর ধ্যানের ভারতকে খুঁজে বেড়িয়েছেন সমগ্র ভারতব্যাপী। নিবেদিতা ও প্রমথনাথ দুজনেই বিপ্লবী ভারতকেই জুড়ে দিয়েছিলেন আধ্যাত্মিক ভারতের সঙ্গে। এই জন্যই বিপ্লবীভারতে দেশাত্মবোধ এসেছিল আত্মত্যাগের সঙ্গে, আত্মবিসর্জনের প্রেরণা নিয়ে। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা স্বতঃই মনে আসে: স্বামীজী বলে গেছেন—"সত্যযুগ ব্রাহ্মণ্য যুগ—এ যুগে জ্ঞানের প্রাধান্য ছিল; ত্রেতাযুগ ক্ষত্রিয় যুগ—এ যুগে রাজকীয় মর্য্যাদারই প্রাধান্য ছিল; দ্বাপর যুগ বৈশ্য যুগ—এ যুগে ব্যবসায়ীদের প্রাধান্য; কলিযুগ শূদ্রযুগ—এ যুগে সমাজের নীচশ্রেণীরই প্রাধান্য হবে।" আজ স্বামীজীর এ বাণী কতকটা সফল হয়েছে। মনে হচ্ছে, ভবিষ্যৎ ভারতে নিম্নশ্রেণীরই প্রাধান্য থাকবে।

আজ শূদ্রশ্রেণীর মধ্যে সমাজচেতনা এসেছে, তারা তাদের শক্তি সম্পর্কে এখন সচেতন কিন্তু তবুও তারা যেন কিছুতেই সমাজে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে না। এর কারণ, হয়ত যে পথ দিয়ে সাম্যবাদ এসেছে তা সেখানে খুব সহজ হয়ে উঠেনি। জড়বাদ ভারতের ঐতিহ্য বিরোধী। এই জড়বাদের সঙ্গে সাম্যবাদের বিরোধীতা যতই বিজ্ঞানভিত্তিক হোকনা কেন, ভারত এনিয়ে এগিয়ে যেতে পারবে কিনা সন্দেহ। স্বামীজী বলে গেছেন, "এর পর আবার যুগ পরিবর্ত্তন আরম্ভ হবে। শূদ্রযুগের পরে আবার আরম্ভ হবে সত্যযুগ—জ্ঞানের যুগ।

সামাজিক প্রত্যেকটি লোক একজন জ্ঞানীর হস্তে তার মঙ্গলা-মঙ্গল ন্যস্ত করে নিশ্চিন্ত হতে পারবেন। অথবা সাম্যবাদ কম্যুনিজম যদি তার জড়বাদ ত্যাগ করে ভারতীয় ঐতিহ্য অনুযায়ী আধ্যাত্মিকতা গ্রহণ করতে পারে, অন্ততঃ ভারতের জন্য তাহলে এর অগ্রগতি হবে অপ্রতিরোধ্য।

শিশুকাল থেকেই প্রমথনাথের আধ্যাত্মিকতা শিক্ষা আরম্ভ হয়। তিনি বলেছেন, "অতি শৈশবেই মা আমায় শিখিয়ে-ছিলেন চোখ বুজে কিছুক্ষণ ধ্যান করতে। 'তখন ধ্যান কাকে বলে বুঝতাম না। তবুও মাকে সন্তুষ্ট করার জন্য চোখ বুজে কিছুক্ষণ ধ্যান করতাম "

বিলাত গিয়ে ইংরেজ জাতির দেশপ্রীতির দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে প্রমথনাথ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অন্য একজন প্রতিজ্ঞা করলেন যে, দেশে ফিরে দেশের সেবা করবেন, পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙবেন এবং দেশকে স্বাধীন করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবেন। তখন ফরাসীদেশের সহিত স্পেনদেশের যুদ্ধ চলছিল। প্রমথ নাথ যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার জন্য ফরাসী প্রেসিডেন্টের সহিত সাক্ষাৎ করে ফরাসী সৈন্যদলে স্বেচ্ছাসেবক হবার অনুমতি প্রার্থনা করেন। প্রার্থনা অনুমোদিত হল। তবে প্রত্যেক স্বেচ্ছাসেবককে একটি রিভলবার, একখানা তরবারি এবং একটা রাইফেল সংগ্রহ করতে হবে। প্রমথনাথ ইংলণ্ডে ফিরে এসে বইপত্র বিক্রি করে এবং ওগুলি সংগ্রহ করে যখন ফরাসীদেশে ফিরে গেলেন, তখন শুনলেন, যুদ্ধ থেমে গেছে, দুই পক্ষে সন্ধি হচ্ছে।

সুরেন্দ্রনাথের পূর্বেই প্রমথনাথ ব্যারিষ্টারী পাশ করে দেশে ফিরে আসেন। ফিরবার সময়ে সুরেন্দ্র নাথ বললেন,—"যাও, দেশে গিয়ে দল বাঁধতে থাক।"

দেশে ফিরে প্রমথনাথ ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়ে মন না দিয়ে মন দিলেন বিপ্লবীদল গঠনে। দেশের সামরিক জাতি বলতে তখন হাড়ি, মুচি, ডোম প্রভৃতি নীচ শ্রেণী। এদের মধ্য থেকেই রাজার

সৈন্যদল গঠিত হত এবং ইংরেজ আমলেও এই প্রথা কিছুটা অব্যাহত ছিল। জমীদার শ্রেণীর জমিজমা রাখার জন্য লাঠিয়াল সংগ্রহ হত এদের মধ্য থেকেই। প্রমথনাথও এদের নিয়েই ড্রিল করাতে লাগলেন। ক্রমে সহস্রাধিক সৈন্য সংগৃহীত হল। সুরেন্দ্র নাথ এই সময়ে দেশে ফিরে এলেন। প্রমথনাথের সৈন্য-বাহিনী দেখে তিনি তো অবাক্। কিন্তু বাদ সাধলেন প্রমথ নাথের পিতা বিপ্রদাস বাবু। তিনি বুঝলেন, পুত্র কলকাতায় থাকলে ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়ে মন দিতে পারবে না। তিনি তার সৈন্য-বাহিনী নিয়েই মেতে থাকবেন। তিনি প্রমথনাথকে মফঃসলে কোথাও গিয়ে প্রাকটিস করতে বললেন। প্রমথনাথ চিরদিন পিতৃমাতৃ ভক্ত। পিতার আজ্ঞা অনুযায়ী তিনি প্রথমে মেদিনীপুর এবং পরে সেখান থেকে বরিশাল যান। বরিশালে নমশূদ্র জাতি লাঠিয়াল হিসাবে প্রসিদ্ধ। তিনি এদের নিয়ে লাঠিয়াল দল গঠন করেছিলেন। ১৮৮২ খৃঃ অব্দে সুরেন্দ্রনাথ যখন মানহানির দায়ে কারারুদ্ধ, প্রমথ নাথ বরিশাল থেকে নমশূদ্র লাঠিয়াল এনে জেল ভেঙ্গে সুরেন্দ্র নাথকে মুক্ত করবার প্রস্তাব করেছিলেন।

বরিশালে ভাগ্যলক্ষ্মী প্রমথনাথের প্রতি সুপ্রসন্ন হন। ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়ে তাঁর পসার জমে ওঠে। এই সময়ে ১৮৮৫ খৃঃ অব্দে সুরেন্দ্র নাথ কলকাতায় রিপণ কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। সুরেন্দ্র নাথ প্রমথনাথকে বরিশাল থেকে কলকাতায় ডেকে আনেন এবং কলেজে ইংরেজী ও ইতিহাস অধ্যাপনার ভার দেন। এই সঙ্গে তাকে হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় করবারও সুযোগ করে দেন। প্রমথনাথ যখন কলকাতায় ফিরে আসেন তার আগের গড়া সৈন্যদল তখন ভেঙ্গে গেছে।

প্রমথনাথের এক মামাশ্বশুর থাকতেন পাইকপাড়ায়। আইন ব্যবসায়ে প্রমথনাথের পসার বৃদ্ধির চেষ্টা করতেন তিনি। তাঁর গৃহে প্রায়ই এক সন্ন্যাসীকে দেখা যেত। একখানি ইংরেজী কাগজের পরিচালক জনৈক সিন্ধুদেশবাসীও ঐ বাড়ীতে

আসতেন। একদিন প্রমথনাথ তাঁর সঙ্গে কথা বলছিলেন ইংরেজী ভাষায়, জার্মান ও ফরাসীদের মধ্যে আসন্ন যুদ্ধ বিষয়ে। এই সময়ে সাধুজী ঘরে ঢুকে তাঁদের পাশে এসে বসলেন। তাঁদের কথাবার্তা শুনে হঠাৎ বলে উঠলেন—"ও লড়াই হোগা নেহি। হোগা, তব আভি নেহি, বহুৎ দের হ্যায়।" নেংটী পরা এক সন্ন্যাসী তাদের কথার উত্তর দিবেন এটা প্রমথনাথ বা তার সঙ্গী কেউ পছন্দ করলেন না। তাই তারা ইংরেজী ছেড়ে কথা আরম্ভ করলেন ফরাসী ভাষায়। কিন্তু এবারেও সাধু মাঝে মাঝে উত্তর দিতে লাগলেন যেন ফরাসী ভাষা তিনি বুঝছেন। এবারে তারা ফরাসী ভাষা ছেড়ে ইটালীয়ন ভাষা ধরলেন। কিন্তু সাধুর কথায় এ ভাষায়ও তার দখল আছে বুঝা গেল।

পরবর্ত্তী রবিবার প্রমথনাথ সাধুর ঠিকানা সংগ্রহ করে তার আশ্রমে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি যে সেদিন সকল ভাষায়ই কথার উত্তর দিচ্ছেলেন, আপনি কি ওসব ভাষা জানেন ?" সাধু বললেন, "নেহিজী।" "তবে কি করে বুঝলেন ?" "তোম্ লোগকা মন্ ভাও ম্যায় সমঝ্ লিয়া।

প্রমথনাথ এবারে জোর করে ধরলেন, "কি করে মন ভাও বোঝেন আমাকে বোঝাতে হবে।" সাধু নানা কথায় প্রমথনাথকে ভোলাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু প্রমথনাথ নাছোড়বান্দা। সমস্ত দিন সাধুর সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন। সাধুও একভাবে বসে। কারও আহার-নিদ্রা নেই। ক্রমে রাত্রি হল। ভোর হল, এমন সময়ে দেখা গেল, সাধু যেন জ্যোতির্মণ্ডলের মধ্যে বসে আছেন। প্রমথনাথ সাধুর দুই পা জড়িয়ে ধরলেন-আমাকে দীক্ষা দিন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সাধু বললেন—"তোর গুরু আমি নই। তবে তুই বড় ভাগ্যবান পুরুষ। তোর গুরু নিজে এসে তোর বাড়ী উপস্থিত হবেন। চিন্তা নাই। প্রমথনাথ বলেন," এই ব'লে তিনি আমাকে একটি মন্ত্র শিখিয়ে দিয়ে

বললেন—"যতদিন তোর গুরু না আসেন, ততদিন এই মন্ত্রটি জপ করিস, তোর ভাল হবে।" এর কিছুদিন পরে জগতপুর আশ্রমের স্বামী পূর্ণানন্দ এসে প্রমথনাথকে দীক্ষা দিয়ে যান। এ সম্পর্কে প্রমথনাথ বলেছেন—

"একদিনের এক সন্ধ্যার জন্যও আহ্নিকক্রিয়া বাদ দিই নাই। রেলে ষ্টীমারে চলতে অনেক সময়ে বাথরুমে ঢুকে নিশ্চিন্ত মনে নিরালায় সন্ধ্যা বন্দনা করেছি। ঘুমের মধ্যে গায়ত্রীজপ, প্রাণায়াম করছি, টের পেয়েছি। বস্তুত: ব্রহ্মগায়ত্রীটি এতই মিষ্ট যে, তা জিভ থেকে ছাড়তে ইচ্ছে হয় না। গুরুবীজ নামক বীজমন্ত্রটি অদ্ভুত শক্তিশালী। চতুবর্ণ যোগটিও অদ্ভূত। এই জ্ঞানযোগে যার অধিকার জন্মে, ভূত, ভবিষ্যত, বর্ত্তমান এই ত্রিকালজ্ঞান তার সহজেই হয়। দেশ কাল মাত্রা জ্ঞানও হয়, আর হয় দূরত্ব দ্বারা বিচ্ছিন্ন পদার্থের বা বিষয়ের জ্ঞান।"

মুক্তির নূতন পথ—আশুতোষ দাসগুপ্ত (পৃ: ২১)

১৯০৭ সালের ডিসেম্বর মাস। তখন স্বদেশী যুগ। স্থানীয় সরকারী কর্তৃপক্ষ মুসলমানদিগকে হিন্দুদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করছিল। এর ফলে একদিন প্রায় ৪০০ মুসলমান এসে পুলিনবাবুর গৃহ আক্রমণ করে। পুলিনবাবুর গৃহে তখন ৭।৮ জন মাত্র লাঠিয়াল ছিলেন। কিন্তু ৭।৮ জনের লাঠির কাছেই সেই ৪০০ মুসলমানকে হটে যেতে হল। কিন্তু সরকার পক্ষে ব্যবস্থা হল উল্টা। তারা পুলিনবাবুকেই গ্রেপ্তার করলেন। মামলায় পুলিনবাবুর পক্ষ সমর্থন করতে কলকাতা থেকে ঢাকা যান প্রমথনাথ। তাঁর সঙ্গে যান সমিতির সম্পাদক সতীশ বসু। কিন্তু মোকদ্দমার দিন সওয়াল জবাব করে এসে প্রমথনাথ বলেন, "ইংরেজের কাছে বিচার প্রার্থনা করা বৃথা। এখন আমাদের করতে হবে এই—তোমরা যা ইচ্ছে তাই করো, কিছু বলব না, কিছু করব না আমরা। যা হবার হোক। কারণ ওরা বেশ বুঝে নিয়েছে, আমরা ওদের উচ্ছেদ চাই। সুতরাং ওদের কাছে সুবিধে চাওয়া বা পাওয়ার আশা করা আমাদের পক্ষে

বাতুলতা মাত্র। এ যেন গান্ধীবাদের আগমনী ধ্বনি অসহযোগ।"

আমরা দেখি জীবনব্যাপী যোগ সাধনের ফলই প্রমথনাথের জীবনে ফলতে আরম্ভ করেছিল, যেমন হয়েছিল অরবিন্দর জীবনে। এইজন্যই যোগসে হোগা নেই, হোগা তরবারিসে এর 'নেই' কথাটিকে বাক্যের শেষ অংশের সঙ্গে যুক্ত করাই তিনি অধিকতর সমীচীন মনে করতেন। ব্যারিষ্টার হয়ে আদালতে দাঁড়িয়ে বিপ্লবী আসামীর পক্ষ সমর্থনে কোন লাভ হবে না মনে করতেন। তবুও এর সঙ্গে আরও একটি জিনিসের তিনি সমন্বয় চেয়েছিলেন। অর্জুন দ্রোণাচার্যের নিকট দীর্ঘদিন ধরে অস্ত্র শিক্ষা করেছিলেন। কিন্তু তবুও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধজয়ের উপযোগী শক্তি তাঁর সংগ্রহ হয়নি। সে শক্তি সংগ্রহ করতে হয়েছিল তপস্যা করে পাশুপত অস্ত্র সংগ্রহ করে। প্রমথনাথের মনেও এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল। ভারতের স্বাধীনতা শুধু কেবলমাত্র অস্ত্র সাহায্যে হবে না। অস্ত্রের সঙ্গে চাই কর্মীদের যোগসাধন, এইজন্যই সশস্ত্র বিপ্লবের সঙ্গে এসেছিল ব্রহ্মচর্য্য, যোগসাধন, গীতা এবং অন্যান্য ধর্মপুস্তক। এর ফলে বহু বিপ্লবীর জীবনে বিপ্লবের আকর্ষণ অপেক্ষা যোগের আকর্ষণই অধিক হয়েছে। এইজন্যই সংসারজীবন ত্যাগ করে বিপ্লবীরা সন্ন্যাসজীবন গ্রহণ করেছেন। তাঁর ফলে কখনও বিপ্লবীজীবনও ত্যাগ করেছেন কেহ কেহ, তাদের কাছে সন্ন্যাস জীবনের আকর্ষণ অধিকতর ফলপ্রসূ হয়েছে। এর পরের ঘটনা প্রমথনাথ নিজেই বলেছেন, "ঠিক তখনই স্পেনদেশে একটা যুদ্ধ চলছিল। তাতে লিপ্ত ছিল ফরাসীজাতি। এক বন্ধুকে নিয়ে মিলিত হলাম প্যারিসে। অনেক বেগ সহ্য ক'রে ফরাসী প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করলাম। আমরা ভলান্টিয়ার হব। ফরাসী প্রেসিডেন্ট অনুমোদন করলেন। কিন্তু আমাদের দু'জনের প্রত্যেকের একটা রিভলভার, একখানা তরোয়াল ও একটা রাইফেল যোগার করতে হবে। তাই ফিরে এলাম ইংলণ্ডে। বইপত্র সব বিক্রী ক'রে অস্ত্র ও পোষাকে সুসজ্জিত হয়ে

এবার গেলাম বিস্কে উপসাগরের তীরে কিন্তু গিয়েই শুনতে পেলাম উপ্রয়র জলকির মধ্যে সন্ধি হয়ে গিয়েছে। তাই যুদ্ধক্ষেত্র আর দেখা হল না।"

ঢাকা ও কলকাতা সমিতির মিলিত উদ্যোগে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ সম্পর্কে শ্রীশচীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "ইতিমধ্যে অস্ত্র সংগ্রহের জন্য পুলিশকে কোন সংবাদ না দিয়ে কলকাতা পালিয়ে এসেছিলাম। সতীশবাবু তাঁর বাড়ীর সংলগ্ন একটি একতলা বাড়ী ভাড়া নিয়ে থাকবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। কিছু কিছু অস্ত্র সংগ্রহ হচ্ছিল। আমরা ৮।১০ জন ছিলাম। ঐ বাড়ীতেই একটি নিভৃতস্থানে সংগৃহীত অস্ত্রগুলি গোপণ ক'রে রাখতাম। একদিন গভীর রাত্রিতে ঐ গৃহে পুলিশ হানা দেয়। কিন্তু সতীশবাবু এবং শচীনবাবু পূর্বে সন্দেহ করে অস্ত্রশস্ত্র সরিয়ে ফেলায় সে যাত্রায় প্রায় সকলেই রক্ষা পায়।

এটা ১৯১২ সনের ঘটনা। শচীন্দ্রনাথ তখন ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় হাইকোর্টের বিচারে বেকসুর মুক্তি পেয়েছেন। নিম্ন আদালতে তাঁর ৭ বৎসর কারাদণ্ড হয়েছিল। শচীনবাবু জেলে থাকা অবস্থায়ই প্রমথনাথের মৃত্যু হয়।

শেষ পরিচ্ছেদ

প্রমথনাথ কি সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসী ছিলেন?

কেহ কেহ মনে করেন প্রমথনাথ সশস্ত্র বিপ্লবে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন না। তার কারণ, অনুশীলন সমিতির সর্বাধিনায়ক হয়েও তিনি কখন পুলিশী নিগ্রহ অথবা জেল ভোগ করেন নাই। কিন্তু তাই ব'লে সশস্ত্র বিপ্লবে তাঁর বিশ্বাস সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকার কারণ নাই। কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করলেই এ বিষয়টি বুঝা যাবে।

১) ১৮৭২ সালে আই. সি. এস. পরীক্ষায় প্রতিযোগিতা করবার জন্য তিনি বিলাত যান। তখন তাঁর বয়স ১৫ বৎসর মাত্র। ঐ অল্প বয়সেই তাঁর মধ্যে স্বাধীনতা স্পৃহা জন্মেছে। দেশকে

স্বাধীন করার উদ্দেশ্যে প্রথমেই তিনি অস্ত্র শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বোধ করলেন। এদেশে বাঙ্গালীর সৈন্যদলে প্রবেশের অধিকার নাই। এজন্য ইংলণ্ডে গিয়েই তিনি ইণ্ডিয়া অফিসে বার বার আবেদন করতে লাগলেন। কিন্তু প্রমথনাথের আবেদন ব্যর্থ হল। কারণ, বার বারই উত্তর এক—বাঙ্গালী সামরিক জাতি নয়। কিন্তু প্রমথনাথ নিরাশ হলেন না। এরপরে তিনি ফ্রান্সে গিয়ে ফরাসী ঔপনিবেশিক বাহিনীতে প্রবেশের চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রমথনাথ ফরাসী নাগরিক নন বলে সে চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। অন্য কোন উপায় নাই দেখেই তিনি ক্ষান্ত হন।

স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রমথনাথ সশস্ত্র বিপ্লবই একমাত্র পথ ব'লে মনে করতেন। ১৮৮৫ খৃঃ অব্দে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পরে প্রথমে তিনি কংগ্রেসে যোগ দেন। কংগ্রেসের একচ্ছত্র নেতা সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর বরাবর অকৃত্রিম বন্ধুত্ব ছিল। দুজনে এক সঙ্গে বিলাতে ছিলেন। প্রমথ নাথ নিজেও খ্যাতিমান ব্যারিষ্টার। সুতরাং কংগ্রেসের নেতৃত্ব করবার মত যথেষ্ট গুণ প্রমথনাথের ছিল। কিন্তু কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদনের নীতিতে প্রমথনাথের বিশ্বাস ছিল না। এইজন্য কংগ্রেসের আপোষমুখী নীতি তাঁকে বিন্দুমাত্র আকর্ষণ করতে পারেনি। তাছাড়া কংগ্রেসের আরও দুজন বিশিষ্ট নেতা অরবিন্দ এবং চিত্তরঞ্জন দাস অনুশীলন সমিতির সহ সভাপতি ছিলেন। সুতরাং কংগ্রেস সংগঠনে প্রমথনাথ একেবারে নিঃসহায় ছিলেন না। এ সত্ত্বেও তিনি মনে-প্রাণে কংগ্রেসে যোগ দিতে পারেন নাই। প্রমথনাথের সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসই ছিল এপথে প্রধান বাধা। স্বাধীনতা কেউ কাউকে দেয় তিনি বিশ্বাস করতেন না। ইংরেজ ভারতবাসীর আচরণে সন্তুষ্ট হয়ে তাদের একদিন স্বাধীনতা দিয়ে ভারত ত্যাগ করবে একথা শুনলে তিনি হেসেই উড়িয়ে দিতেন। বৃটিশ সাম্রাজ্য সম্পর্কে তিনি বলতেন, "যে জাতির সাম্রাজ্য বিস্তারের ক্ষুধা এতকাল পরেও মিটেনি সেই জাতি তার সুবিস্তৃত

সাম্রাজ্যের এক বিশাল অংশ ভারতবর্ষকে শাসন বন্ধন ও শোষণ পাশ থেকে বিনা সংগ্রামে স্বেচ্ছায় মুক্তি দিয়ে চলে যাবে, এরূপ কখনও আশা করা যেতে পারে না।" সুতরাং স্বাধীনতার 'জন্য সংগ্রাম করা ছাড়া আমাদের অন্য কোন উপায় নাই। ইহাই তিনি কায়মনোপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। ১৯০৬ খৃঃ অব্দে ঢাকা অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠা-বৈঠকে একথা তিনি সুস্পষ্টভাবেই বলেছিলেন। বৈঠকে উপস্থিত ব্যক্তিগণ যখন দেশোদ্ধারের নানা পন্থায় কথা বলেছিলেন, পি. মিত্র হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বললেন, "এই সমস্ত স্বদেশী-দেশী, বিলাতী বর্জন টর্জনে কিছুই হবে না। ক্ষমতা থাকে তো ইংরেজ তাড়াও, নয়তো মরো।" কয়েকজন উকিল প্রতিবাদে সভা ত্যাগ করলেন। কিন্তু প্রমথনাথ সভাক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে বললেন: "The sword has been drawn, it must be thrust in the breast of our enemies or in our own breast." সুতরাং স্বাধীনতার জন্য ভারতবাসীকে সশস্ত্র সংগ্রাম করতে হবে এ সম্পর্কে প্রমথনাথের মনে কোন দ্বিধা বা সঙ্কোচ ছিল না।

১৯০৬ খৃঃ অব্দে ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন দাদাভাই নৌরজী। ঐ সময়ে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে সুবোধ মল্লিকের ভবনে প্রথম বিপ্লবী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। সভাপতির আসন গ্রহণ করেন অনুশীলন সমিতির সর্বাধিনায়ক প্রমথনাথ মিত্র। মুন্সেফ অবিনাশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, অরবিন্দ ঘোষ, সুবোধচন্দ্র মল্লিক, অবিনাশ ভট্টাচার্য্য, পুলিন বিহারী দাস, দেবব্রত বসু, অন্নদা কবিরাজ, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ইন্দ্র নন্দী, যতীন্দ্রনাথ মুখার্জি প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। সভাপতির ভাষণে শ্রীপ্রমথনাথ মিত্র বলেন, কোন এক নিভৃত স্থান ক্রয় করে সেখানে সদস্যদের সামরিক শিক্ষা দিবার

ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। প্রমথনাথ এর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। সুতরাং প্রমথনাথ সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসী ছিলেন না একথা কোন প্রকারেই বলা চলে না।

১৯০৬ সালের পূজার ছুটীর আগে ঢাকা অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠার পরেই সমবেতভাবে ঢাকা ও কলকাতায় অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ আরম্ভ হয়। কিন্তু এ বিষয়ে ঢাকার চেয়ে কলকাতায় সুযোগ ছিল বেশী। সাধারণতঃ জাহাজের নাবিকেরা বিদেশ থেকে রিভলবার প্রভৃতি অতি সামান্য মূল্যে কিনে আনত। বিপ্লবীরা তা' তাদের কাছ থেকে নিয়ে নিতেন। গড়বেতার বসন্তকুমার সরকার এই সময়ে প্রেসিডেন্সী কলেজে বি কোর্সে'র ছাত্র ছিলেন। তিনি হিন্দু হোষ্টেলে থাকতেন। তিনি অনুশীলন সমিতির সদস্য ছিলেন। সংগৃহীত অস্ত্রশস্ত্র মজুত রাখবার উদ্দেশ্যে ১৯০৭ সালে তিনি ঢাকার অনুশীলন সমিতির নেতা পুলিন বিহারী দাসের জন্য পটুয়াটোলা লেনে একটি ঘর ভাড়া নেন। ১৯০৭ সালের ডিসেম্বর মাসে ঢাকা সমিতির উদ্যোগে ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট এলেন সাহেবকে গোয়ালন্দ স্টেশনে হত্যা করা হয়। হত্যাকারী শচীন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফেরার অবস্থায় বসন্তকুমার গড়বেতায় নিজের বাড়ীতে রাখেন। সেখানে তার নাম ছিল নলিনী সরকার। কলকাতা সমিতির সেক্রেটারী সতীশ বসুই বসন্তকুমারের গৃহে তাঁর আহারের ব্যবস্থা করেন। এই সময়ে প্রমথনাথ জীবিত ছিলেন কিন্তু এলেন হত্যার জন্য তিনি পুলিন বিহারীকে কোন প্রকার ভর্ৎসনা করেন নাই। বসন্তকুমার বলেন, "জাহাজের নাবিক, বন্দুকের দোকান, ধনী ব্যক্তি এবং জমিদারদের নিকট থেকে আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহের ভাল ব্যবস্থা ছিল। পুরুলিয়া জেলার ঝালদায় দেশী রিভলবার, বন্দুক প্রভৃতি তৈরীর জন্য একটি কারখানা স্থাপনে অম্বিকানগরের রাজার খুব সাহায্য পাওয়া গিয়েছিল। আমাদের দলের নলিনী দেব একটি প্রথম শ্রেণীর Seven Repeating Winchester Rifle সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিল। ঢাকা অনুশীলন

সমিতি এবং আমাদেরও অস্ত্রশস্ত্র রাখিবার ঘরের প্রয়োজন হয়। সিমলা ষ্ট্রীটের বাই লেনে কড়ুই-এর নগেন্দ্র ঘোষের নামে একটি ঘর ভাড়া নিই। তিনি সস্ত্রীক দোতলায় থাকতেন। নীচে অস্ত্রশস্ত্র থাকত। এই সকল অস্ত্রশস্ত্র সতীশ বসুর হেফাজতে থাকত।" এখান থেকে অস্ত্র নিয়ে ঢাকা অনুশীলন সমিতির 'বারহা' সশস্ত্র অভিযানে যোগ দেওয়া হয়। ১৯০৬ সালেব ২রা জুন বারহা অভিযান অনুষ্ঠিত হয়। কলকাতা থেকে অস্ত্র নিয়ে বসন্ত সরকার বারহা যান। বাঁকুড়ার এক মুন্সেফের পুত্র শৈলেন চক্রবর্তী বসন্ত বাবুর সঙ্গে ছিলেন। তাঁরা দুজনেই অভিযানে অংশ গ্রহণ করেন। তিন দিন তিন রাত ধরে অভিযান সংগ্রাম চলে। ১লা জুন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ইডেন হিন্দু হোটেল থেকে রাত্রির ট্রেনে দুজনে রওনা হয়। তারা একটি ট্রাঙ্কে উইন চেষ্টার রাইফেলটি, কলকাতা অনুশীলন সমিতির কয়েকটি রিভলবার এবং ঢাকা সমিতির কয়েকটি পিস্তল ও রিভলবার নিয়ে যান। তিন দিন তিন রাত্রি ধরে সশস্ত্র সংগ্রামে দূর পাল্লার উইন চেষ্টার রাইফেলটি খুব কাজে লেগেছিল। নলিনী দেব এই রাইফেলটি ঠাকুরবাড়ী থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। অভিযানে বসন্ত বাবুই রাইফেলটি নিয়ে নৌকার উপর বসেছিলেন। কার্য্য উদ্ধারের পর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বসন্তবাবুও শৈলেন্দ্র নাথ কলকাতায় চলে আসেন। ঢাকা অনুশীলন সমিতির অস্ত্রশস্ত্রও কলকাতায় ফেরত আসে। কলকাতা সমিতির এই অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করার জন্য তিন হাজার টাকা কলিকাতা সমিতির সতীশবাবুর হাতে দেওয়া হয়। নির্দেশ দেওয়া হয় যে, এই টাকায় যেন পুনরায় অস্ত্রশস্ত্র কেনা হয়। এই সমস্ত ব্যবস্থা প্রমথনাথের উদ্যোগেই ঘটেছিল। সতীশ বাবু প্রমথনাথকে জানিয়ে সবকিছু করেছিলেন।

১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতা কংগ্রেস অধিবেশন সময়ে ঢাকা থেকে পুলিন বিহারীর সঙ্গে শচীন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি আরও ৩০।৩২ জন কলকাতায় আসেন। ঢাকায় ফিরবার সময়ে

সতীশ বাবু শচীন বাবুর হাতে কয়েকটি রিভলবার, কিছু টোটা এবং একখানা সাইকেল দিলেন। শচীন বাবু বলেছেন, "তখন কলকাতার সভ্যরা আমাদের ভাই-এর মতো ভালবাসতো। আমাদের জন্য গর্বানুভব করত।" ঝাণ্ডা অভিযানেও নেতৃত্ব করেন শচীন্দ্রনাথ। ঘটনার পরে তিনি ফেরার অবস্থায় কলকাতা সতীশবাবুর নিকট আসেন। সতীশবাবু শচীন্দ্রনাথকে কিছুদিন কলকাতায় রেখে পরে বৈদ্যনাথ পাঠিয়ে দেন। এই সময়ে তিনি কখনও ভাগলপুর, কখনও পাটনায় থাকতেন। কিছু সময় কাশীতেও কাটিয়েছেন। সব ব্যবস্থাই সতীশ বাবু করেছেন এবং প্রমথনাথে জ্ঞাতসারেই সব হয়েছে।

পুলিন বিহারীর স্বগ্রাম ছিল ফরিদপুর জেলায় লোলসিংহ। পাশেই লড়িয়া বাজার। পুলিন বিহারী সংবাদ নিয়ে জানলেন বাজারের এক মহাজনের দোকানে ৮০ হাজার নগদ টাকা আছে। তা'ছাড়া অন্যান্য দোকানেও বহু টাকা আছে। তিনি স্থির করলেন লড়িয়া বাজার থেকে এক লক্ষ টাকা সংগ্রহ করবেন এবং এই টাকা দিয়ে অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করবেন। ডাকাতির পথে অস্ত্র সংগ্রহ পদ্ধতি একেবারে ত্যাগ করবেন। বিশেষভাবে প্রমথনাথ ডাকাতি দ্বারা অর্থ সংগ্রহে অনিচ্ছুক। এজন্য বিশেষ উদ্যোগ-আয়োজন করে লড়িয়া বাজার লুণ্ঠনের ব্যবস্থা করলেন। বিনা বাধায় এ কার্য্য হবে না। তাই বেশ কিছু সদস্য এই কার্য্যে নিয়োগ করলেন এবং কলকাতা সমিতির অস্ত্রশস্ত্রগুলিও কাজে লাগাবেন। পুলিন বিহারী কলকাতা থেকে অস্ত্রশস্ত্র চেয়ে পাঠালেন। কলকাতা এবং ঢাকা সমিতির সব অস্ত্রই সতীশবাবু পাঠিয়ে দিলেন। বারহা অভিযানের ৬।৭ মাস পরে এই অভিযান। বারহা ডাকাতি থেকে লব্ধ টাকার মধ্যে তিন হাজার টাকা প্রমথনাথের নির্দেশে পুলিনবাবু সতীশচন্দ্রের হাতে অশস্ত্র ক্রয়ের উদ্দেশ্যে দেন একথা আগেই বলা হয়েছে। এই সময়ে ব্যবস্থা হয়েছিল যে, সতীশবাবু মাঝে মাঝে অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করে ঢাকাতে পাঠিয়ে

দিবেন। বাজার লুণ্ঠনের নির্দিষ্ট দিনের দুই তিন দিন আগে সতীশচন্দ্র কলকাতার সংগৃহীত টাকা এবং কলকাতা সমিতির সমস্ত অস্ত্র পূর্ববারের মত এবারও পুলিন বিহারীর নিকট পাঠিয়ে দিলেন। এবার অস্ত্র নিয়ে এলেন দলের বিশিষ্ট সদস্য নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (স্বনাম খ্যাত মানবেন্দ্রনাথ রায়)। নরেন্দ্রনাথ দুইটি ট্রাঙ্কে কয়েকটি রাইফেল এবং প্রচুর পরিমাণ কার্টিজ নিয়ে এলেন। সুতরাং এ সমস্ত ঘটনা প্রমথ নাথের না জানবার কথা নয়। প্রকৃতপক্ষে তিনি সব কথাই জানতেন। ঢাকার বিশিষ্ট নাগরিক স্বনামখ্যাত উকিল রজনীগুপ্ত ডাকাতির সমর্থক ছিলেন না কিন্তু যখন তিনি জানতে পারেন যে, পি. মিত্র, অরবিন্দ ঘোষ প্রভৃতি সমিতির জন্ম ডাকাতি সমর্থন করছেন তখন তিনি তাঁর প্রতিবাদ পরিত্যাগ করেন এবং এই ব্যাপারে নিরপেক্ষ থাকেন।

বাজার লুণ্ঠনের কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রায় ২ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হল। কিন্তু এই সময়ে হঠাৎ এক দুর্ঘটনা ঘটে গেল। বাজারের এক দোকানে কয়েক টিন কেরোসিন সঞ্চিত ছিল। বিপ্লবদলের একটি মশাল হাত থেকে তার মধ্যে পড়ে যাওয়ায় আগুন জ্বলে উঠল এবং ক্রমে সে আগুন সমগ্র বাজারে ব্যাপ্ত হল। ফলে এই অভিযান অর্ধসমাপ্ত অবস্থায়ই পরিত্যক্ত হয়।

১৯১০ খৃঃ অব্দের জুলাই মাসে পুলিন বিহারী প্রভৃতি ৪৭ জনকে গ্রেপ্তার করে সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ষড়যন্ত্র অভিযোগে ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয়। ঢাকার কর্মীদের গ্রেপ্তারের সংবাদেই প্রমথনাথের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। অল্প কয়েকদিন পরেই প্রমথনাথ সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হন। ২৩শে সেপ্টেম্বর তিনি দেহত্যাগ করেন। অসুস্থ অবস্থায় শয্যাশায়ী থেকেই তিনি সুরেন্দ্রনাথকে ডেকে ঢাকার মামলা পরিচালনা সম্পর্কে আলোচনা করেন। ঢাকা ষড়যন্ত্র অথবা আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলায় যে তাঁকে

অভিযুক্ত করা হয় নাই তার কারণ আলিপুর মামলার কিছুদিন আগেই বারীন্দ্র কুমার প্রভৃতি কর্মীগণ পি. মিত্র থেকে কিছুটা আলাদা হয়েই সরকারী কর্মচারী হত্যাকার্য্য আরম্ভ করেন। সশস্ত্র বিপ্লবের প্রথম দিকে প্রস্তুতি পর্বে প্রমথনাথ এই সরকারী কর্মচারী হত্যা সমর্থন করেন নাই। সেজন্য যে সকল অভিযোগে আলিপুর মামলা আরম্ভ হয় তার সঙ্গে প্রমথনাথের প্রত্যক্ষ কোন সংযোগ ছিল না। কিন্তু ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কে, এ-কথা বলা চলে না। সরকারী কর্মচারী হত্যা সমর্থন না করলেও প্রমথনাথ সশস্ত্র বিপ্লব সমর্থন করতেন। এই উদ্দেশ্যেই তিনি অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করছিলেন। প্রমথ নাথ পূর্ণ স্বাধীনতা চাইতেন এবং সশস্ত্র বিপ্লব ছাড়া পূর্ণ স্বাধীনতা সম্ভব নয় ব'লেই তিনি জানতেন। বিপ্লবের প্রথম পর্বে ছোটখাটো বৈপ্লবিক কার্য্য-কলাপের মাধ্যমে প্রস্তুতি পর্ব চলে। ঐ সময়ে সরকারী পদস্থ কর্মচারী অথবা গবর্ণর প্রভৃতি হত্যাকাণ্ডের ফলে বিপ্লবের প্রস্তুতি কার্য্যে ব্যাঘাত ঘটে। এইজন্যই তিনি এই ধরণের হত্যাকার্য্য সমর্থন করেন নাই। কিন্তু তাই ব'লে তিনি যে সশস্ত্র বিপ্লব সমর্থ করতেন না নয়। সশস্ত্র বিপ্লব না চাইলে তিনি কংগ্রেসের মধ্যে থেকে নিরাপদে রাজনীতি করতে পারতেন। এমন কি চরমপন্থী রাজনীতি করবার পথেও কোন বাধা ছিল না। ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলার উদ্বোধনী বক্তৃতায় সরকার পক্ষের উকিল পি. এল্. রায় বলেন যে, বৃটিশ রাজত্বের উচ্ছেদ সাধন ক'রে তিলককে ভারতের সম্রাট এবং পি. মিত্রকে বড়লাট করাই অনুশীলন সমিতির উদ্দেশ্য। সুতরাং প্রমথনাথের প্রতি যে সরকার পক্ষের লক্ষ্য ছিল না তা নয়। কিন্তু ঐ সময় পর্য্যন্ত তারা এ সম্পর্কে যথেষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারে নাই। অত শীঘ্র তার মৃত্যু না ঘটলে শেষ পর্য্যন্ত কি ঘটত বলা যায় না।

প্রমথনাথ সশস্ত্র বিপ্লবের উদ্দেশ্যে যে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ আরম্ভ করেছিলেন শেষ পর্যন্ত তা' অব্যাহত ছিল। কলকাতায় এই

কার্য্যের ভার গ্রহণ করেছিলেন সতীশচন্দ্র বসু। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সময়ে এই অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ সম্পর্কে সতীশচন্দ্র বলেন, "যুদ্ধের সময়ে ঢাকার অবনী প্রথমে ১৩টি রিভলবার লুকাইয়া আমাকে দেন। ইনি আমেরিকা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আমাকে প্রথমে একটা রিভলবার দেন। পরে তার সন্ধান কার্য্য সাহায্যে আরও ১২টি রিভলবার পাই। এই সময়ে আমরা আরও অনেক রিভলবার ও অস্ত্রশস্ত্র পাই। আমরা চন্দননগরে শিশির বসুর মারফৎ কতকগুলি অস্ত্রশস্ত্র লুকায়িত করি। পরে ঢাকা, ময়মনসিংহ এবং মালদহে বেশী পরিমাণ যায় আশুবাবু চারদিকে এই সব মাল পাঠান। ঢাকায় মাল সর্ববেশী প্রেরিত হয়, তৎপর রঙ্গপুরে যায়।"

(২) দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম ডঃ ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত (পৃঃ ১৮৭)

এইসব অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ কার্য্য প্রমথনাথই মৃত্যুর পূর্বে আরম্ভ করে গিয়েছিলেন। সুতরাং সশস্ত্র বিপ্লবে তাঁর বিশ্বাস ছিল না, এ কিছুতেই সম্ভব হতে পারে না। বরং এদিয়ে তাঁর সশস্ত্র বিপ্লবে পূর্ণ বিশ্বাসই প্রমাণ করে।

তবে প্রমথনাথ ছিলেন মনে-প্রাণে ভারতীয়। তাই ভারতীয় ভাবধারাদ্বারা তিনি নিয়ন্ত্রিত হতেন। ভারতের পৌরাণিক সাহিত্য আলোচনা করে তিনি দেখেছিলেন, অর্জুন দ্রোণাচার্য্যের নিকট সাধারণ সব অস্ত্র ব্যবহার শিখেছিলেন কিন্তু তা সত্ত্বেও কুরু-ক্ষেত্র যুদ্ধ জয়ের জন্য তাঁর পাশুপত অস্ত্র বা দৈব সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছিল। তাই প্রথমদিকে তাঁর অস্ত্রশস্ত্রের উপর পূর্ণ বিশ্বাস থাকলেও মৃত্যুর পূর্বে সে বিশ্বাস কিছুটা ভারতীয় পৌরাণিক এই মতবাদদ্বারা কিছুটা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন, ভারতের স্বাধীনতা কেবলমাত্র অস্ত্র সাহায্যে আসবে না। অর্জুনের মত বিপ্লবী কর্মীদেরও তপস্যালব্ধ শক্তির সাহায্য নিতে হবে। এই তপস্যালব্ধ শক্তিই বিপ্লবীদের যোগশিক্ষা। দিল্লীতে

তাঁর নিজের জীবনের একটি ঘটনা—"যোগ সে হোগা নেই, হোগা তরবারি সে" এবং ভগিনী নিবেদিতা কথিত কুরুক্ষেত্র ডাকবাংলায় নিদ্রিত অবস্থার গীতার শ্লোক আবৃত্তি শ্রবণ—এই দুইটি ঘটনার প্রভাব এই যোগ ধর্ম্মের উপর থাকতে পারে। এই দুইটি ঘটনার উল্লেখই প্রমথনাথ ঢাকা অনুশীলন সমিতির অন্যতম নেতা এবং পুলিন বিহারীর সহকর্মী আশুতোষ দাসগুপ্তের নিকট করেছিলেন। এই দুইটি কাহিনী বলেই তিনি আশু-বাবুকে যোগে দীক্ষা দিয়েছিলেন।

(কাহিনী দুটি এই পুস্তকেরই অন্যত্র দ্রষ্টব্য)